এসএসসি প্রোগ্রাম : বাংলা প্রথম পত্র

কবিতা : কবিগণ

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

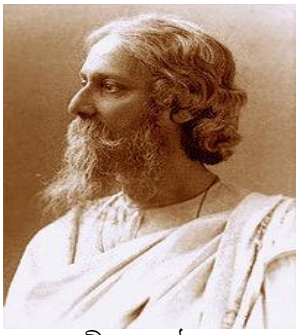
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কাজী নজরুল ইসলাম

জীবনানন্দ দাশ

জসীমউদ্‌দীন

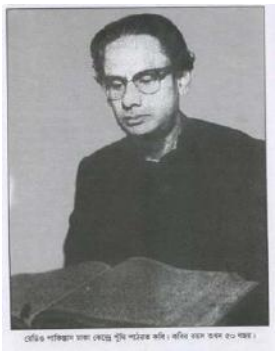
ফররুখ আহমদ

আহসান হাবীব

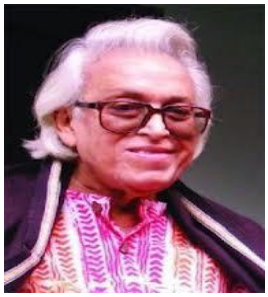
শামসুর রাহমান

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

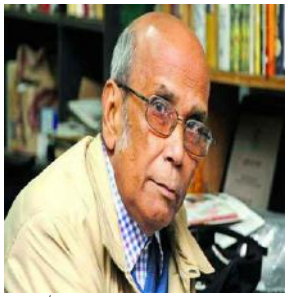
সৈয়দ শামসুল হক

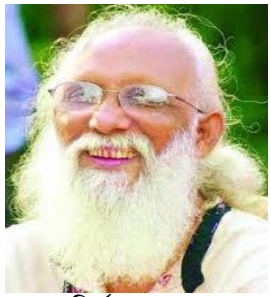
নির্মলেন্দু গুণ

	সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন– আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স টিউটর	**ড. মো. চেঙ্গীশ খান** সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা), ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫। ইমেইলঃ chenggish@gmail.com এবং **মেহেরীন মুনজারীন রত্না** সহকারী অধ্যাপক (বাংলা), ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫। ইমেইলঃ meherin2010.bou@gmail.com

আমার সন্তান

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

কবি-পরিচিতি

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ও মঙ্গলকাব্যের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ১৭১২ সালে হুগলি জেলার ভুরশুট পরগনার পেঁড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ভুরশুট পরগনার জমিদার ছিলেন, কিন্তু বর্ধমানের রাজার সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় বাস্তুচ্যুত হয়ে সপরিবারে ভারতচন্দ্রের মামাবাড়িতে চলে আসেন। সেখানে থেকেই ভারতচন্দ্র মাত্র কুড়ি বছর বয়সের মধ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ, অভিধান ও ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। জীবনের বহু উত্থান-পতনের পর ভারতচন্দ্র নদীয়ার কৃষ্ণনগর রাজপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও সভাকবি হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেন এবং রায়গুণাকর খেতাব পান। সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ও হিন্দুস্তানি ভাষার মিশ্রণে নতুন এক বাগভঙ্গি এবং তাতে শব্দ, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগ ছিল তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যকে তুলনা করেছেন 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'র সঙ্গে। তিনি ১৭৬০ সালে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের পরিসমাপ্তি ঘটে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

সত্যপীরের পাঁচালী, রসমঞ্জরী, অন্নদামঙ্গল, নাগাষ্টক, গঙ্গাষ্টক, চণ্ডীনাটক।

ভূমিকা

'আমার সন্তান' কবিতাটি আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত 'মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যানে'র 'অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা' কবিতার সম্পাদিত অংশ 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের অংশবিশেষ। নিজ স্বার্থ উপেক্ষা করে সন্তান তথা সাধারণ মানুষের কল্যাণ কামনার চিরন্তন মানসিকতার বিষয়টি মুখ্য হয়ে এ কবিতায় ফুটে উঠেছে। কবিতাটিতে মধ্যযুগের শেষ পর্বের ভাষা-বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মধ্যযুগের সামাজিক প্রথা, সংস্কার, পৌরাণিক চরিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যাবে এই কবিতার মাধ্যমে। দেবীকর্তৃক ভক্তকুলের মনোবাঞ্ছা পূরণের ধরন এবং রূপকের মাধ্যমে সমস্ত বাঙালি সন্তানের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আশীর্বাদের বিষয়টি নিপুণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এই কবিতায়।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- পুরনো বাংলা কবিতার ভাষা-বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- দেবী অন্নপূর্ণা আর ঈশ্বরী পাটুনীর কাহিনি বর্ণনা করতে পারবেন;
- 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' –উক্তিটির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে ॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি ॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি ॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার ॥
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥

... ...

পাটুনী বলিছে মা গো শুন নিবেদন।
সেঁউতী উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ ॥
পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতী উপরে ॥

... ...

সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতী হইল সোনা দেখিতে দেখিতে ॥
সোনার সেঁউতী দেখি পাটুনীর ভয়।
এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় ॥
তীরে উত্তরিল তরী তারা উত্তরিলা।
পূর্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা ॥
সেঁউতী লইয়া বক্ষে চলিলা পাটুনী।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিয়া আপনি ॥
সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল ॥
হের দেখ সেঁউতীতে থুয়েছিলা পদ।
কাঠের সেঁউতী মোর হৈলা অষ্টাপদ ॥
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয় ॥
তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার ॥
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয়।
সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয় ॥
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া।
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া ॥
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে ॥

কত দিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে।
ছাড়িলাম তার বাড়ি কন্দলের ত্রাসে ॥
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব।
বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব ॥
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে জোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান ॥

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অন্নপূর্ণা– অন্নদাত্রী; দেবী দুর্গা। ***অষ্টাপদ–*** সোনা; স্বর্ণ। ***উত্তরিলা–*** উপস্থিত হলেন। **কন্দল–** ঝগড়া। **কহিছে–** বলেছে। **কাশী–** তীর্থস্থান; পুণ্যস্থান। **কুলবধূ–** গৃহবধূ। **খেয়া–** নৌকা। ***গজগমনে–*** হস্তীর ন্যায় ধীর ও গুরুগম্ভীর চলন। ***গাঙ্গিনীর–*** নদীর। **ছল–** ছলনা। **তথাস্তু–** ঠিক আছে। ***ত্বরায়–*** তাড়াতাড়ি; দ্রুত। ***থুয়েছিলা–*** রেখেছিলে। **দুধে ভাতে–** কোনো অভাবে না থাকা। **নিবাস–** বাসস্থান; আবাস। ***পাটুনী–*** খেয়াঘাটের মাঝি। ***ফেরফার–*** ছলাকলা; ঘোরপ্যাঁচ। ***বট–*** বল। ***বরদান–*** আশীর্বাদ। ***বামাস্বর–*** স্ত্রীকণ্ঠ; মেয়েদের কণ্ঠস্বর। **মাগ–** প্রার্থনা করা। **শুক্ল অষ্টমী-** তিথির নাম; শুক্ল পক্ষের অষ্টম রাত। ***সেঁউতী–*** নৌকার পানি সেচবার জন্য ব্যবহৃত পাত্র। ***হের–*** দেখ। **হৈলা–** হলো।

সারসংক্ষেপ :

অন্নপূর্ণা অর্থাৎ দেবী দুর্গা গৃহবধূর বেশে খেয়া পার হতে এসেছেন। তাঁর পায়ের স্পর্শে নৌকার সেঁউতি সোনা হয়ে যায়। তখন খেয়া পারাপারকারী ঈশ্বরী পাটুনী বুঝতে পারে, ইনি দেবী। পরে দেবী নিজেই নিজের পরিচয় দেন। পাটুনীকে বর চাইতে বলেন। পাটুনী নিজের জন্য কিছু না চেয়ে সন্তানের জন্য বর চায়। দেবী আশা পূরণ করে বলেন : তোমার সন্তান দুধে-ভাতে থাকবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'সত্যপীরের পাঁচালী'র লেখক কে?
ক. নবীনচন্দ্র রায় খ. হেমচন্দ্র রায়
গ. ভারতচন্দ্র রায় ঘ. প্রফুল্লচন্দ্র রায়

২. 'ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী' এখানে 'ঈশ্বরী' বলতে যাকে বোঝানো হয়েছে–
ক. ঈশ্বরী দেবী খ. ঈশ্বরী রায়
গ. ঈশ্বরী পাটুনী ঘ. ঈশ্বরী সাহা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আলী অটোরিক্সা চালাতে গিয়ে অনেক সময় বিপদে পড়া যাত্রীদের মুখোমুখী হয়। এভাবে সে একদিন একজন মহিলাকে রাস্তায় একাকী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার পরিচয় জানতে চায়। মহিলা আলীকে নিজের সব পরিচয় জানালেও স্বামীর নামটি বলেনি।

৩. উদ্দীপকের মহিলার সঙ্গে 'আমার সন্তান' কবিতার কার মিল রয়েছে?
ক. অন্নপূর্ণা খ. ঈশ্বরী পাটুনী
গ. মানসিংহ ঘ. ভবানন্দ

৪. উদ্দীপক ও 'আমার সন্তান' কবিতায় স্বামীর নাম মুখে নিতে চাওয়া হয়নি যে কারণে–
ক. স্বামী বেকার খ. স্বামী সন্ত্রাসী
গ. সংস্কার ঘ. লোকলজ্জা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন রাজার সভাকবি ছিলেন?
ক. কৃষ্ণচন্দ্র রায় খ. গৌরাঙ্গচন্দ্র রায় গ. মানিকচন্দ্র রায় ঘ. যশোধাচন্দ্র রায়

৬. 'আমার সন্তান' কবিতায় 'দুধেভাতে' থাকা হচ্ছে–
i. সবসময় দুধ-ভাত খাওয়া ii. ঐশ্বর্যশালী হতে চাওয়া iii. প্রশান্তিতে জীবনযাপন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i গ. ii ঘ. iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আমার মায়ের চোখ মমতায় পূর্ণ হয়ে আছে
বিশাল নীরব মেঘমুক্ত সাদা আকাশের মতো!

৭. উদ্দীপকটির সঙ্গে 'আমার সন্তান' কবিতায় যার সাদৃশ্য রয়েছে–
ক. অন্নপূর্ণা খ. হরিহোড় গ. পাটুনী ঘ. ভবানন্দ

৮. উদ্দীপকের সঙ্গে 'আমার সন্তান' কবিতার সাদৃশ্যের ক্ষেত্র হলো–
i. মানবতাবোধ ii. ঈশ্বরভক্তি iii. সন্তানবাৎসল্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবর। হুমায়ুন ছিলেন তাঁর পরম আদরের সন্তান। একবার হুমায়ুন কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। অনেক সাধ্য-সাধনার পরও তার রোগের কোনো উপশম হচ্ছিল না। বরং দিনে দিনে অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে। অগত্যা বাবর জনৈক দরবেশের পরামর্শে মহান প্রভুর উদ্দেশ্যে ধ্যানমগ্ন হন। প্রভুর নিকট তিনি নিজের জীবনের বিনিময়ে পুত্রের জীবন ভিক্ষা চান। মহান প্রভু তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। অতঃপর একসময় সম্রাট বাবর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। আর হুমায়ুন অনারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ করে জীবন ফিরে পান।

ক. বামাস্বর কী?
খ. 'এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়' –কথাটি কেন বলা হয়েছে?
গ. উদ্দীপকের বাবরের সঙ্গে 'আমার সন্তান' কবিতার কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? –আলোচনা করুন।
ঘ "উদ্দীপক ও 'আমার সন্তান' কবিতার মূলসুর একই।" – মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. বামাস্বর শব্দের অর্থ হচ্ছে নারীকণ্ঠ অর্থাৎ মেয়েদের কণ্ঠস্বর।

খ. ঈশ্বরী পাটুনীর খেয়া নৌকায় নদী পার হতে আসা বধূটির পায়ের স্পর্শে সেঁউতি সোনা হয়ে গেলে তার মনে হয় যে এ মেয়েটি সাধারণ ঘরের কেউ নয়, এ কোনো দেবতা হবে।
'আমার সন্তান' কবিতায় দেবী অন্নপূর্ণা ঘরের বউয়ের ছদ্মবেশে নদী পার হতে আসে। খেয়া নৌকার মাঝি ঈশ্বরী পাটুনী তার পরিচয় জানতে চায়। কিন্তু দেবী বাঙালি নারী স্বামীর নাম মুখে নেয় না বলে বিষয়টি এড়িয়ে যান। পরে ঈশ্বরী পাটুনীর অনুরোধে দেবী নৌকার সেঁউতিতে পা রাখেন। তার রাঙা চরণের ছোঁয়ায় সেঁউতি তখন সোনা হয়ে যায়। দৃশ্যটি দেখতে পেয়ে পাটুনী অনুমান করে যে, এ মেয়েটি সাধারণ কেউ নয়, নিশ্চয়ই কোনো দেবী হবেন।

গ. উদ্দীপকের বাদশাহ বাবরের সঙ্গে 'আমার সন্তান' কবিতার ঈশ্বরী পাটুনীর সাদৃশ্য রয়েছে।
মানুষের নিকট সবচেয়ে প্রিয় তার নিজের জীবন। সন্তানের প্রাণ বাঁচাতে মানুষ নিজের জীবনকেও উৎসর্গ করতে পারে। সন্তানের প্রতি গভীর ভালোবাসা সম্রাট বাবর ও নৌকার মাঝি ঈশ্বরী পাটুনীকে সমপর্যায়ে নিয়ে এসেছে। দুজনেরই ভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে নিজেদের প্রিয়সন্তান। এদের মধ্যে একজন নিজের সন্তানের প্রাণ বাঁচানোর জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, আর অন্যজন সন্তানের মঙ্গলকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

উদ্দীপকে বাদশাহ বাবর যখন শুনলেন তাঁর কোনো প্রিয় বস্তুকে নিঃশঙ্ক চিত্তে উৎসর্গ করলে প্রিয় সন্তানের প্রাণ ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তখন তিনি সন্তানের জন্য নিজের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেন। নিজের জীবনের বিনিময়ে সন্তানের প্রাণ রক্ষা করে বাদশাহ বাবর বাৎসল্যপ্রীতির চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। অনুরূপভাবে 'আমার সন্তান' কবিতায় দেখা যায় নৌকার মাঝি ঈশ্বরী পাটুনী দেবী অন্নপূর্ণার কাছে নিজের জন্য কোনো বর না চেয়ে সন্তানের জন্য সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন। এভাবে দেখা যায় ঈশ্বরী পাটুনীর সন্তানের জন্য তীব্র ভালোবাসা প্রকাশের সঙ্গে বাদশাহ বাবরের সন্তান বাৎসল্যের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তুই 'আমার সন্তান' কবিতার মূল আলেখ্য।

মানুষ নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। আবার পিতা-মাতার নিকট নিজের সন্তানের জীবন সবচেয়ে মূল্যবান। সন্তানের সুখের জন্য মানুষ নিজের জীবনের আনন্দ-সুখ ত্যাগ করতে দ্বিধা করে না। 'আমার সন্তান' কবিতার মূলভাব হচ্ছে সন্তানের জন্য একজন দরদী জননীর অপরিমেয় ভালোবাসা। উদ্দীপকের মধ্যেও একজন ভারত সম্রাট অর্থাৎ একজন বাবাকেও সন্তানের জন্য চরম ত্যাগ স্বীকার করতে দেখি।

কবি ভারতচন্দ্র রচিত 'আমার সন্তান' কবিতায় দেবী অন্নপূর্ণা গৃহবধূর ছদ্মবেশ ধারণ করে নদী পার হওয়ার জন্য খেয়াঘাটের মাঝি ঈশ্বরী পাটুনীর নৌকায় ওঠেন। অন্নপূর্ণার পাদস্পর্শে নৌকার সেঁউতি সোনা হয়ে গেলে ঈশ্বরী পাটুনী বুঝতে পারে তার নৌকার যাত্রী কোনো সাধারণ মহিলা নন। অবশ্য দেবী শেষ পর্যন্ত পাটুনীর নিকট নিজের পরিচয় দিতে বাধ্য হন। পরবর্তী সময়ে দেবী পাটুনীকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। পাটুনী দেবীর নিকট খুব বেশি কিছু চায়নি। অবশ্য সে ইচ্ছা করলে নিজের জন্য অনেক ধনসম্পদ চাইতে পারত। কিন্তু সে নিজের জন্য কিছু না চেয়ে সন্তানের জন্য 'দুধ-ভাত' অর্থাৎ সচ্ছল জীবন-যাপনের নিশ্চয়তা চেয়েছে। মোটকথা নিজের জীবনের চেয়ে সন্তানের জীবনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে খেয়াঘাটের মাঝি ঈশ্বরী পাটুনী। উদ্দীপকেও আমরা একই চেতনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করি। এখানে বাদশাহ বাবরের পুত্র হুমায়ুন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে রয়েছেন। কোনো চিকিৎসকের চিকিৎসাই তাকে ভালো করতে পারছে না। অবশেষে একজন দরবেশ বাদশাহ বাবরকে পরামর্শ দিলেন বাবর যেন তার সন্তানের জন্য কোনো প্রিয় বস্তু উৎসর্গ করেন।

'আমার সন্তান' কবিতায় পিতা সন্তানের প্রশান্তিময় জীবন কামনা করেছেন। আর উদ্দীপকে বাবর মহান প্রভুর নিকট আরজ করেন যে তাঁর জীবনের বিনিময়ে পুত্র হুমায়ুনকে যেন ভালো করে দেয়া হয়। কেননা বাবর জানেন মানুষের নিকট তার নিজের জীবনের চেয়ে প্রিয় কোনো বস্তু নেই। প্রভুর নিকট নিজের জীবনকে সমর্পণ করলেন বাদশাহ বাবর। অন্তরে আশা তাঁর একমাত্র সন্তান যেন ভালো থাকে। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপক ও 'আমার সন্তান' কবিতার মূলসুর একই ।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

নামাযের ঘরে মোমবাতি মানে, দরগায় মানে দান,
ছেলেরে তাহার ভালো করে দাও কাঁদে জননীর প্রাণ।
ভালো করে দাও আল্লা রসুল ভালো করে দাও পীর,
কহিতে কহিতে মুখখানি ভাসে বহিয়া নয়ন নীর।

ক. 'বরদান' কী?
খ. ভারতচন্দ্রের কাব্যের বৈশিষ্ট্য কেমন?
গ. উদ্দীপকের কবিতাংশে 'আমার সন্তান' কবিতার যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকটি 'আমার সন্তান' কবিতার সমগ্র ভাবকে ধারণ করেনি।" –যুক্তি সহকারে আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. খ ৩. ক ৪. গ ৫. ক ৬. ঘ ৭. গ ৮. গ

কপোতাক্ষ নদ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবি-পরিচিতি

১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত এবং মাতা জাহ্নবী দেবী। মধুসূদনের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় সাগরদাঁড়ির গ্রামের পাঠশালায়। শৈশবেই তিনি ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অতঃপর তিনি কলকাতার হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। এ সময় তিনি ডিরোজিও প্রভাবিত ইয়ং-বেঙ্গল দল দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। বাল্যকাল থেকেই মধুসূদন ইংরেজি কবিতার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বিলেতে গিয়ে তিনি বড় কবি হবেন এ-ই ছিল তাঁর বাল্যের স্বপ্ন। এ উদ্দেশ্যেই ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর নামের প্রথমে যোগ হয় 'মাইকেল'। ১৮৬২ সালে মধুসূদন ইউরোপ যান। তিনি লন্ডনে ব্যারিস্টারি পাস করেন। লন্ডন থেকে তিনি ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে যান ও বেশ কয়েক বছর অবস্থান করেন। প্রথমে ইংরেজি ভাষায় কবিতা রচনা আরম্ভ করলেও কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন এবং বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে রেখে যান অক্ষয় অবদান। বিষয় ভাবনা, জীবনার্থ এবং প্রকরণ-শৈলীর স্বাতন্ত্র্যে মধুসূদনের রচনা আধুনিকতার শিখরস্পর্শী। অমিত্রাক্ষর ছন্দরীতির আবিষ্কার ও 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা তাঁর অমর কীর্তি। মহাকাব্য, সনেট, পত্রকাব্য, প্রহসন, ট্র্যাজেডি নাটক ইত্যাদি সাহিত্যশাখা বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন কলকাতার আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কাব্যগ্রন্থ	:	*তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী*;
নাটক	:	*পদ্মাবতী, শর্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী*;
প্রহসন	:	*একেই কি বলে সভ্যতা?, বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ*;
গদ্য-কাব্য	:	*হেকটর-বধ (অসমাপ্ত)*।

ভূমিকা

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' নামক সনেট কাব্য থেকে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটি সঙ্কলিত হয়েছে। এ কবিতায় কবির শৈশবে দেখা কপোতাক্ষ নদের প্রতি ভালোবাসার অন্তরালে স্বদেশপ্রেমের বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে। সাময়িক মোহে পাশ্চাত্য সাহিত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়ে প্রবাস জীবনে স্বদেশের প্রতি অনুরাগের স্বরূপ তাঁর স্মৃতি বিজড়িত বর্ণনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবির আকূল আকুতি কপোতাক্ষ নদ যেন তাঁর স্বদেশের প্রতি হৃদয়ের কাতরতা বঙ্গবাসীর নিকট ব্যক্ত করে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- সনেট কবিতার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- কবির ভাষাপ্রেম ও দেশপ্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে !
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-মন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।

আর কি হে হবে দেখা? – যত দিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সংগীতে।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

কর– খাজনা; রাজস্ব। **কলকলে–** নদীর কলকল আওয়াজে। **নিশা–** রাত্রি; রাত। **বঙ্গজ জন–** বঙ্গে জন্মেছেন যিনি, বাঙালি। **বঙ্গের সঙ্গীতে–** বাংলার গানে। **বারি–** পানি। **বারি-রূপ কর–** জল রূপ খাজনা, প্রজা যেমন রাজাকে কর বা রাজস্ব দেয় তেমনি কপোতাক্ষ নদও সাগরকে জলরূপ কর বা রাজস্ব দিচ্ছে। **বিরলে–** একান্ত নিরিবিলিতে। ***ভ্রান্তি–*** ভুল। **ভ্রান্তির ছলনে–** ভুলের ছলনায়। **মিনতি–** প্রার্থনা। **যেমতি–** যেমন। **সখা-রীতে–** বন্ধুর রীতিতে; বন্ধুর নিয়মে। **সতত–** সর্বদা; সবসময়।

চতুর্দশপদী কবিতা– ইংরেজিতে Sonnet, বাংলায় চতুর্দশপদী কবিতা। গীতিকবিতার যে রূপটি চৌদ্দ চরণ এবং চৌদ্দ মাত্রার সমন্বয়ে গঠিত হয় তাকে চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেট বলে। চতুর্দশপদী কবিতার প্রথম আট চরণের স্তবককে অষ্টক (Octave) এবং পরবর্তী ছয় চরণের স্তবককে ষষ্টক (Sestet) বলে। অষ্টকে মূলত ভাবের প্রবর্তনা এবং ষষ্টকে ভাবের পরিণতি থাকে। চতুর্দশপদী কবিতায় কয়েক প্রকার অন্ত্যমিল প্রচলিত আছে। যেমন, প্রথম আট চরণ : কখখক কখখক। শেষ ছয় চরণ : ঘঙচ ঘঙচ। অথবা প্রথম আট চরণ : কখখগ কখখগ, শেষ ছয় চরণ : ঘঙঘঙ চচ। 'কপোতাক্ষ নদ' একটি চতুর্দশপদী কবিতা। এখানে মিলবিন্যাস : কখকখকখখক গঘগঘগঘ।

সারসংক্ষেপ :

বিদেশে বসে দেশের নদী কপোতাক্ষের কথা কবির মনে পড়ে। বহু দেশের বিচিত্র নদী কবি দেখেছেন। কিন্তু ওই নদীর তুলনা আর কোথাও পাননি। তাঁর কাছে এ নদী মায়ের দুধের মতো তৃপ্তিদায়ক। কবির আশঙ্কা, তাঁর সাথে কপোতাক্ষের আর দেখা নাও হতে পারে। কবির আকুতি : বিদেশে বসেও কবি যে দেশের নদীরই গান গাইছেন, কপোতাক্ষ যেন বাংলার মানুষকে সে কথাটা জানায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সনেটের বৈশিষ্ট্য কী?
ক. আট চরণ, চৌদ্দ মাত্রা খ. ছয় চরণ, ছয় মাত্রা গ. চৌদ্দ চরণ, চৌদ্দ মাত্রা ঘ. আট চরণ, আট মাত্রা

২. 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় যাকে 'রাজ'রূপে কল্পনা করা হয়েছে–
ক. সাগরকে খ. কবিকে গ. জন্মভূমিকে ঘ.স্বদেশকে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

'কোথায় হারিয়ে গেল সোনালী বিকেলগুলো সেই–
আজ আর নেই।'

৩ উদ্দীপকে প্রকাশিত অনুভূতি নিচের কোন রচনায় ফুটে উঠেছে?

ক. আমার সন্তান খ. পল্লিজননী গ. কপোতাক্ষ নদ ঘ. মানুষ

৪. 'কপোতাক্ষ নদ' ও উদ্দীপকের অনুভূতির যে বিষয়ে মিল রয়েছে–

i. স্নেহকাতরতা ii. স্মৃতিকাতরতা iii. মানবপ্রেম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii. গ. iii ঘ. i ও ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. মধুসূদন দত্ত কত সালে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন?

ক. ১৮৪১ খ. ১৮৪২ গ. ১৮৪৩ ঘ. ১৮৪৪

৬. 'বঙ্গজ জনের কানে' এখানে 'বঙ্গজ জন' বলতে কবি বুঝিয়েছেন–

i. বাংলার প্রবাসী জনগণকে ii. বাংলায় নিবাসী জনগণকে iii. বাংলাভাষী ভিনদেশী জনগণকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি।

৭. উদ্দীপকের আঙ্গিকের সঙ্গে নিম্নের কোন কবিতার মিল রয়েছে?

ক. স্বাধীনতা খ. মানুষ গ. পল্লিজননী ঘ. কপোতাক্ষ নদ

৮. উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে–

ক. দেশপ্রেম খ. প্রকৃতিপ্রেম গ. মানবপ্রেম ঘ. বাৎসল্যপ্রেম

সৃজনশীল প্রশ্ন :

লাবণ্যকে উচ্চশিক্ষার্থে ম্যাসাচুসেটস্ সিটিতে শিকড় গাড়তে হয়। সেখানকার পরিবেশে সে এখনো খাপ খাইয়ে উঠতে পারেনি। সারাক্ষণ তার অন্তর পড়ে থাকে দেশে অবস্থানরত মা-বাবা আর স্বজনদের নিকট। প্রবাসে জন্মভূমি বাংলার প্রকৃতি তার চোখ জুড়ে স্নেহের পরশ বুলিয়ে যায়। বাংলা গান না শুনলে তার চোখে ঘুম আসে না। এভাবে শয়নে-স্বপনে দেশ এবং দেশের মানুষগুলো তার নিকট স্বপ্নময় হয়ে ওঠে।

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কীর্তি কোনটি?

খ. 'চতুর্দশপদী কবিতা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের লাবণ্যের সঙ্গে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবির সাদৃশ্য কোথায়? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. "লাবণ্য ও কবির ভাবানুভূতির অন্তরালে কাজ করেছে গভীর দেশপ্রেম।" –উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কীর্তি 'মেঘনাদবধ কাব্য'।

খ. গীতিকবিতার যে রূপটি চৌদ্দ চরণ এবং চৌদ্দ মাত্রার সমন্বয়ে গঠিত হয় তাকে চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেট বলে। সনেট কখনো চৌদ্দ চরণের কম বা বেশি হয় না। প্রতিচরণে সাধারণত চৌদ্দটি মাত্রা ব্যতিক্রম হিসেবে আঠারো মাত্রা থাকে। সনেটের প্রথম আট চরণের স্তবককে বলা হয় অষ্টক এবং শেষ ছয় চরণের স্তবক বলা হয় ষটক। প্রথম স্তবকে

অর্থাৎ অষ্টকে থাকে ভাবের বিস্তার, আর শেষ স্তবকে অর্থাৎ ষটকে থাকে ভাবের পরিসমাপ্তি। বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথম সনেট জাতীয় কবিতার প্রবর্তন করেন।

গ. স্বদেশ ও জন্মভূমির প্রতি অনুভূতির দিক দিয়ে কবি মধুসূদন ও লাবণ্যের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়।
স্বদেশপ্রেম একটি অশরীরী অনুভূতি। পৃথিবীর সকল মানুষই জন্মভূমির মাটি, মানুষ, প্রকৃতিকে ভালোবাসে। পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষই স্বদেশের জন্য বিরহ বেদনা অনুভব করে। 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবি ও উদ্দীপকের লাবণ্যের মধ্যে আমরা সেই অকৃত্রিম দেশপ্রেমের চিত্রই দেখতে পাই।
উদ্দীপকের লাবণ্য ম্যাসাচুসেটস্ সিটিতে উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি জমায়। সেখানে তার কিছুই ভালো লাগে না। সবসময় তার মন পড়ে থাকে দেশে মা-বাবা আর স্বজনদের নিকট। বাংলার প্রকৃতি, বাংলার মানুষ, বাংলার গান তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। যেমন 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবি মধুসূদন প্রবাস জীবনে নিজ দেশের প্রিয় নদীটিকে ভুলতে পারেননি। জীবনের প্রয়োজনে কবি কত দেশে গিয়েছেন, কতো নদী-সরোবর দেখেছেন, কিন্তু তার প্রাণের তৃষ্ণা মেটেনি।একমাত্র কপোতাক্ষ নদের জল তার স্নেহের তৃষ্ণা মেটাতে পারে বলে তিনি মনে করেন। জন্মভূমিকে ভালোবাসেন বলেই কবির মনে এ অনুভূতি কাজ করেছে। বলা যায়, প্রবাস জীবনের আনন্দ-উল্লাস কিংবা ভোগ-বিলাস কবি মধুসূদন কিংবা লাবণ্য কারো কাছে ভালো লাগেনি। উভয়ের কাছে দেশপ্রেম তথা জন্মভূমি প্রীতিই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। বস্তুত দেশপ্রেমের দিক থেকেই কবি ও লাবণ্যের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. লাবণ্য ও কবি মধুসূদনের গভীর অনুভূতির পেছনে যে বিষয়টি কাজ করেছে তা হচ্ছে অকৃত্রিম দেশপ্রেম।
বাস্তব পৃথিবীতে একজন দেশপ্রেমিক মানুষ কখনোই তার দেশকে ভুলতে পারেন না। দেশের মাটি, মানুষ, নদ-নদী, মায়াভরা প্রকৃতি সবকিছুই যেন তাকে ফিরে ফিরে ডাকে। কেবল জন্মভূমির আলো, বাতাস আর পানিতে তার প্রাণের তৃষ্ণা মেটে। বস্তুত এর স্বরূপই ফুটে উঠেছে উদ্দীপক আর 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায়।
উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই লাবণ্য পড়াশোনার জন্য ম্যাসাচুসেটস্-এ গেলেও সেখানে সে মন বসাতে পারে না। তার অন্তর জুড়ে থাকে বাংলার মাটি, মানুষ, প্রকৃতি আর তার আপনজন। সে সারাক্ষণ অন্তরে অনুভব করে বাংলার মমতাময়ী রূপকে। তার জন্মভূমি বাংলা যেন তাকে সবসময় হাতছানি দিয়ে ডাকে। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায়ও অকৃত্রিম স্বদেশপ্রীতি প্রকাশ পেয়েছে। কবিও জীবনে অনেক দেশ ঘুরেছেন। তিনি ফ্রান্সে গিয়েছেন বড় কবি হওয়ার আশায়। কিন্তু সেখানে তাঁর শৈশব ও কৈশোরের আনন্দ কিংবা বেদনা-বিধুর স্মৃতি সারাক্ষণ কাঁদায়। তিনি আবেগে আপ্লুত হন, সুদূর ফ্রান্সে বসেও যেন কপোতাক্ষের কলকল ধ্বনি শুনতে পান। বিদেশের মাটিতে অন্য কোনো জল তাঁর স্নেহের তৃষ্ণা মেটাতে পারে না। একমাত্র কপোতাক্ষ নদের জলই যেন মেটাতে পারে তাঁর অন্তরের অতৃপ্ত তৃষ্ণা। এভাবে কবি দেশের বাইরে গভীরভাবে অনুভব করেন নিজের দেশকে, জন্মভূমিকে। তাই বলা যায়, লাবণ্য ও কবির গভীর জীবন অনুভূতির অন্তরালে কাজ করেছে গভীর দেশপ্রেম।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ দু'পাশে ধানের ক্ষেত
সরু পথ
সামনে ধুধু নদীর কিনার
আমার অস্তিত্বে গাঁথা। আমি উধাও নদীর
মুগ্ধ এক অবোধ বালক।

ক. বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন কে?
খ. 'ভ্রান্তির ছলনে' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
গ. উদ্দীপকে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার যে ভাবটি প্রতিফলিত হয়েছে তা তুলে ধরুন।
ঘ. "উদ্দীপকের ভাবটিই যেন কপোতাক্ষ নদ কবিতার মূল সুর।" –আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. ক ৩. গ ৪. খ ৫. গ ৬. খ ৭. ঘ ৮. ক

জীবন সঙ্গীত

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি-পরিচিতি

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩৮ সালের ১৭ এপ্রিল হুগলি জেলার গুলিটা রাজবল্লভহাট গ্রামে তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। হেমচন্দ্রের পৈতৃক নিবাস ছিল হুগলির উত্তরপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতা কৈলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন খুব দরিদ্র। হেমচন্দ্র কলকাতার খিদিরপুর বাংলা স্কুলে পড়াকালে আর্থিক সংকটে পড়েন ও পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর অত্যন্ত মেধাবি হেমচন্দ্র কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর আশ্রয়ে ইংরেজি শেখেন এবং হিন্দু স্কুলে ভর্তি হয়ে জুনিয়র ও সিনিয়র উভয় পরীক্ষায় বৃত্তি পান। পরে তিনি ১৮৫৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও ১৮৬৬ সালে বিএল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৬১ সালে হাইকোর্টের উকিল হন। ১৮৬২ সালে মুন্সেফ হিসেবে নিয়োগ পেলেও তা ছেড়ে দিয়ে আবার ওকালতি শুরু করেন। ১৮৯০ সালে হাইকোর্টের সরকারি উকিল হন। কর্মজীবনে তিনি আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেও শেষজীবনে আর্থিক সঙ্কটে পড়েন। হেমচন্দ্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো তিনি যেমন গুরুগম্ভীর আখ্যায়িকা কাব্য রচনা করেছিলেন তেমনি আবার সহজ সুরের খণ্ডকবিতা, ওজস্বিনী স্বদেশসঙ্গীত এবং লঘু কবিতাও রচনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনার অনুরাগী ছিলেন এবং কিশোর রবীন্দ্রনাথের লেখায় তাঁর ছায়া পড়েছিল। তাঁর জনপ্রিয়তার মূলে ছিলো স্বদেশচিন্তা ও উনিশ শতকের বাঙালির সমাজ ও রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধের বলিষ্ঠ রূপায়ণ, ভাষা ও ছন্দের অনর্গলতা। শেষজীবনে তিনি অন্ধ হয়ে যান এবং ১৯০৩ সালের ২৪ মে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ :

চিন্তাতরঙ্গিণী (১৮৬১), বীরবাহু (১৮৬৪), বৃত্রসংহার (১৮৭৫), আশাকানন (১৮৭৬), ছায়াময়ী (১৮৮০)।

ভূমিকা

'জীবন সঙ্গীত' কবিতাটি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদমূলক রচনা থেকে গৃহীত। কবিতাটি মার্কিন কবি Henry Wadsworth Longfellow (১৮০৭-১৮৮২)-এর 'A Psalm of life' শীর্ষক ইংরেজি কবিতার ভাবানুবাদ। কবিতাটিতে অত্যন্ত মূল্যবান ও ক্ষণস্থায়ী মানবজীবনের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে যথার্থ কর্মের মাধ্যমে জগতে টিকে থাকার ধারণা লাভ করা যাবে। জীবনের প্রকৃত মূল্য অনুধাবন করে সংসারে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে মহান ব্যক্তিদের আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে বরণীয় হওয়ার প্রক্রিয়া কবিতাটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- মানব-জীবনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- মানব-জীবনের উন্নতির উপায় বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বলো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন,
দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার কে তোমার
বলে জীব করো না ক্রন্দন;
মানব-জনম সার, এমন পাবে না আর
বাহ্যদৃশ্যে ভুলো না রে মন;
কর যত্ন হবে জয়, জীবাত্মা অনিত্য নয়,
ওহে জীব কর আকিঞ্চন।
করো না সুখের আশ, পরো না দুখের ফাঁস,
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়,
সংসারে সংসারী সাজ, করো নিত্য নিজ কাজ,
ভবের উন্নতি যাতে হয়।
দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়,
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির,
সহায় সম্পদ বল, সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ু যেন শৈবালের নীর।
সংসারে-সমরাঙ্গনে যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে,
ভয়ে ভীত হইও না মানব;
কর যুদ্ধ বীর্যবান, যায় যাবে যাক প্রাণ
মহিমাই জগতে দুর্লভ।
মনোহর মূর্তি হেরে, ওহে জীব অন্ধকারে,
ভবিষ্যতে করো না নির্ভর;
অতীত সুখের দিন, পুনঃ আর ডেকে এনে,
চিন্তা করে হইও না কাতর।
মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়
সমর-সাগর-তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত করে
আমরাও হব হে অমর;
সেই চিহ্ন লক্ষ করে, অন্য কোনো জন পরে,
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
করো না মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন,
সংসার-সমরাঙ্গন মাঝে;
সঙ্কল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা,
রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অনিত্য– অস্থায়ী; যা চিরকালের নয়। ***আকিঞ্চন–*** চেষ্টা; আকাঙ্ক্ষা। ***আয়ু যেন শৈবালের নীর–*** শেওলার ওপর পানির ফোঁটার মতো ক্ষণস্থায়ী। ***আশ–*** আশা। ***কাতর স্বরে–*** দুর্বল কণ্ঠে; করুণভাবে। **ক্রন্দন–** কান্না। **ঘুচায়–** অতিবাহিত বা অতিক্রান্ত হওয়া। ***জীবাত্মা–*** মানুষের আত্মা; আত্মা যদিও অমর, কিন্তু মানুষের মৃত্যু অনিবার্য, কাজেই দেহ ছেড়ে আত্মা একদিন চলে যাবে, চিরকাল দেহকে আঁকড়ে থাকতে পারবে না। ***দারা–*** স্ত্রী। **দুর্লভ–** দুষ্প্রাপ্য; পাওয়া কঠিন। **দৃঢ়পণে–** অটল সংকল্প। ***ধ্বজা–*** পতাকা; নিশান। **নিশার স্বপন–** মিথ্যা বা অসার ভাবনা। **পদাঙ্ক–** কোনো মহৎ ব্যক্তির কৃতকর্ম বা চরিত্র। ***প্রাতঃস্মরণীয়–*** সকাল বেলায় স্মরণ করার যোগ্য; অর্থাৎ সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। **ফাঁস–** ফাঁসি; ইচ্ছা অনুযায়ী শক্ত বা শিথিল করা যায় এমন রজ্জু বা দড়ির বাঁধন। ***বরণীয়–*** সম্মানের যোগ্য। ***বাহ্যদৃশ্যে–*** বাইরের জগতের চাকচিক্যময় রূপে বা জিনিসে। ***বীর্যবান–*** শক্তিমান। **বৃথা–** ব্যর্থ। **মহাজ্ঞানী মহাজন–** কীর্তিমান মহৎ ব্যক্তি। ***ভবের–*** জগতের; সংসারের। ***মহিমা–*** গৌরব। **যশোদ্বার–** খ্যাতির দ্বার। ***সমরাঙ্গনে–*** যুদ্ধক্ষেত্রে (কবি মানুষের জীবনকে যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন)। ***সংসারে-সমরাঙ্গনে–*** যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসী সৈনিকের মতো সংসারেও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মোকাবেলা করে বেঁচে থাকতে হবে। **সার–** একমাত্র সম্বল। ***স্বপন–*** রাতের স্বপ্নের মতোই মিথ্যা বা অসার। **স্বীয়–** নিজ; আপন।

সারসংক্ষেপ :

মানুষের জীবন পরম মূল্যবান। এ জীবন স্বপ্ন বা মায়া নয়; অকারণও নয়। দুঃখের জন্য হা-হুতাশ বা সুখের জন্য কাতরতা দেখিয়ে লাভ নেই। বরং কর্তব্যকর্মে অগ্রসর হয়ে বাধাবিঘ্ন জয় করাই সফলতার উপায়। মহাপুরুষদের অনুসরণ করা জরুরি। তাহলে আমরাও তাঁদের মতো হতে পারব। জীবনে সাফল্য লাভের জন্য দরকার বিপদ মোকাবেলা করা আর সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'বৃত্রসংহার' কী জাতীয় রচনা?

ক. গীতিকাব্য　　খ. মহাকাব্য
গ. কাহিনি কাব্য　　ঘ. পত্রকাব্য

২. 'জীবন সঙ্গীত' একটি–

i. অনুবাদমূলক কবিতা　　ii. নীতিশিক্ষামূলক কবিতা　　iii. ভাবানুবাদমূলক কবিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

সুমন্ত কাঞ্জিলাল তার অতীতের স্বর্ণময় জীবনের কথা ভেবে আকুল হন। কেননা আজ তিনি নিঃস্ব, রিক্ত। কোনো কিছুতেই তার মন সায় দেয় না।

৩. উদ্দীপকের ভাবের প্রতিফলন দেখা যায় যে কবিতায়–

ক. প্রাণ　　খ. মানুষ
গ. জীবন সঙ্গীত　　ঘ. কপোতাক্ষ নদ

৪. 'জীবন সঙ্গীত' কবিতা অনুযায়ী সুমন্ত কাঞ্জিলালের ভাবনা–

i. জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ　　ii. সফলতার জন্য প্রেরণা　　iii. সফলতার জন্য প্রতিবন্ধকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii　　গ. iii.　　ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'জীবন সঙ্গীত' কবিতাটি কোন কবিতার অনুবাদ?

ক. A Psalm of life　　খ. A Passion of life

গ. The Sands of Dee　　ঘ. The Horns of Dilema

৬. 'শৈবালের নীর' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

ক. বরণীয়　　খ. দীর্ঘস্থায়ী

গ. ক্ষণস্থায়ী　　ঘ. স্মরণীয়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

তা যদি না পারি, তবে বাঁচি যতকাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই।

৭. 'জীবন সঙ্গীত' কবিতার যে বিষয়টি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে–

ক. খ্যাতি　　খ. বিত্ত

গ. অমরত্ব　　ঘ. বিদ্যা

৮. উদ্দীপক ও 'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় প্রকাশিত জীবন–

ক. নিশার স্বপন　　খ. সমরাঙ্গন

গ. তাৎপর্যময়　　ঘ. মায়ার জগৎ

সৃজনশীল প্রশ্ন :

সময় গেলে সাধন হবে না।
দিন থাকতে দিনের সাধন কেন করলে না ॥
জান না মন খালে বিলে
মীন থাকে না জল শুকালে
কী হয় তার বাঁধন দিলে
শুকনা মোহনা ॥
অসময়ে কৃষি করে
মিছামিছি খেটে মরে
গাছ যদি হয় বীজের জোরে
ফল তো ধরে না ॥

ক. 'নিশার স্বপন' অর্থ কী?

খ. 'ভবের উন্নতি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকটি 'জীবন সঙ্গীত' কবিতার কবির জীবন ভাবনাকে কীভাবে প্রতিফলিত করে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'জীবন সঙ্গীত' কবিতার কেবল একটি বিশেষ দিককে তুলে ধরেছে।" –বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর:

ক. 'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় ব্যবহৃত 'নিশার স্বপন' শব্দের অর্থ হচ্ছে রাতের স্বপ্ন।

খ. 'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় ভবের উন্নতি বলতে সংসার তথা পৃথিবীর উন্নতিকে বোঝানো হয়েছে।

প্রচলিত অর্থে সংসার বলতে দারা-পুত্র-পরিজনের সমবায়কে বোঝায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সংসার মানে মানুষের বসবাসের ক্ষেত্র তথা পৃথিবী। ভব মানে এই পৃথিবীই। ব্যক্তি মানুষ যদি নিজ কর্ম সম্পর্কে সচেতন হয়, তার কর্ম সম্পর্কে দায়িত্বশীল হয় এবং সে তা সুষ্ঠুরূপে পালন করে তবেই ভবের উন্নতি হবে। মূলত কাজকে প্রাধান্য দিলে শুধু

পৃথিবীর উন্নতিই নয়, বরং ব্যাক্তি মানুষেরও উন্নতি সাধন হয়। ব্যক্তি তার মহিমা লাভ করে এবং সে জীবনের প্রকৃত স্বাদও পায়। বস্তুত 'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় 'ভবের উন্নতি' উন্নতি বলতে কবি এটিকেই বুঝিয়েছেন।

গ. উদ্দীপকে বর্তমানকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর এদিকটিই 'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় বর্ণিত কবির জীবন ভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে।

বুদ্ধিমানেরা বর্তমানের ভাবনাই ভাবেন। কেননা অতীত নিয়ে পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না। বরং তা মানুষের জীবনকে স্থবির ও জড় করে দেয়। তাছাড়া কেবল অতীত নিয়ে ভাবলে অনেক সময় ভবিষ্যতের পাথেয়ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। একজন মানুষকে বর্তমানের সর্বোত্তম ব্যবহারই সফল করে তুলতে পারে।

'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় কবি বলেছেন পৃথিবীতে মানব জন্ম অত্যন্ত মূল্যবান। অতীত জীবনের সুখ-স্মৃতি রোমন্থন করে কারোর কাতর হওয়া উচিত নয়। সুখের প্রতিমা গড়ে অজানা ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করাও বোকামি। উদ্দীপকেও দেখা যায় বর্তমানের কাজ বর্তমানেই করতে বলা হয়েছে। বিষয়টিকে নানা উদাহরণের মাধ্যমে উদ্দীপকে বোঝানো হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, সময় অর্থাৎ বর্তমান পার হয়ে গেলে সাধন হবে না। সুতরাং উদ্দীপক ও 'জীবন সঙ্গীত' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো বর্তমানকে যথাসম্ভব গুরুত্ব দিয়ে সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করা। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের জীবন ভাবনা 'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. সময়ের কাজ সময়ে করা উচিত, 'জীবন সঙ্গীত' কবিতার এই বিশেষ ভাবটিই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

ভবের সংসারে মানব জীবন অত্যন্ত মূল্যবান। এখানে মিথ্যা সুখের প্রতিমা গড়ে কোনো লাভ নেই। অবশ্য মানব জীবনের উদ্দেশ্যও তা নয়। সংসারে বাস করতে হলে সংসারের দায়িত্ব সূচারুরূপে পালন করতে হবে। কেননা বৈরাগ্য সাধনে মানুষের মুক্তি নেই।

'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় বলা হয়েছে মানুষের জীবন কেবল নিছক স্বপ্ন নয়। আর এ পৃথিবীকে কেবল স্বপ্ন ও মায়ার জগৎ বলা চলে না। অতীত সুখের দিন ও অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানকে বাদ দিলে চলবে না। বর্তমানেই বর্তমানের কাজ করে যেতে হবে। অন্যদিকে উদ্দীপকে বেশ কয়েকটি উপমা ও চিত্রকল্প ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে নদীতে জল শুকালে যেমন মাছ থাকে না, তেমনি অসময়ে কৃষিকাজ করলে কোনো ফল আসে না। উদ্দীপকের কবির ভাষায় বলা যায়, সময় গেলে সাধন হয় না। 'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় মানব জীবনের অনেকগুলো প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু উদ্দীপকে বার বার এসেছে একটি প্রসঙ্গ। আর এই বিষয়টি হচ্ছে সময়ের যথাযোগ্য ব্যবহার। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'জীবন সঙ্গীত' কবিতার একটি বিশেষ দিককে তুলে ধরেছে, কবিতার সমগ্র ভাবকে নয়।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

সময়ের যারা সদ্ব্যবহার করে, তারা জিতবেই। সময়েই টাকা, সময় টাকার চেয়ে বেশি। জীবনকে উন্নত করো কাজ করে। জ্ঞান অর্জন করো। চরিত্রকে ঠিক করে বসে থাকো। কৃপণের মতো সময়ের কাছ থেকে তোমার পাওনা বুঝে নাও।

ক. 'প্রাতঃস্মরণীয়' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'জীবাত্মা' বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের যে বিষয়টি 'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে তা তুলে ধরুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় রয়েছে জীবনকে সমৃদ্ধ করার মহৎ বাণী।" –বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. ঘ ৩. গ ৪. গ ৫. ক ৬. গ ৭. গ ৮. গ

প্রাণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

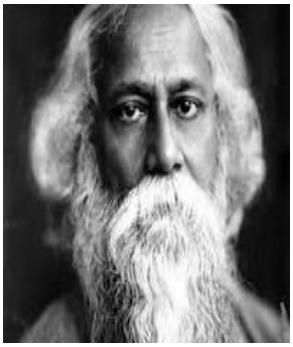

কবি-পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবী। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার জন্য পাঠানো হলেও বিদ্যালয়ের পড়ালেখার প্রতি তিনি মনোযোগী ছিলেন না। ফলে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। ঠাকুর বাড়ির অনুকূল পরিবেশে শৈশবেই রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। ১৮৭৬ সালে পনের বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনফুল'। অতঃপর কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, ভ্রমণসাহিত্য, রম্যরচনা, সঙ্গীত ইত্যাদি শাখায় রবীন্দ্রনাথ রেখে গেছেন তাঁর অসামান্য শিল্পপ্রতিভার স্বাক্ষর। ১৯০১ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়।' এ বিদ্যালয়ই পরবর্তীকালে 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়'-এ রূপলাভ করে। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' (১৯১১) কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে প্রথম কৃষিব্যাংক স্থাপন করেন। বাংলাদেশের শিলাইদহ, পতিসর এবং শাহজাদপুরে জমিদারির তত্ত্বাবধান-সূত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত করেন। বাংলা কবিতাকে তিনিই প্রথম দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রসারিত করেন। বাংলা ছোটগল্পকে তিনিই বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। গীতিকার ও চিত্রশিল্পী হিসেবেও রবীন্দ্রনাথের অবদান অনন্যসাধারণ। তিনি ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ) কলকাতায় পরলোকগমন করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কবিতা	:	*মানসী*, *সোনারতরী*, *চিত্রা*, *গীতাঞ্জলি*, *বলাকা*, *শেষলেখা*;
উপন্যাস	:	*চোখের বালি*, *গোরা*, *ঘরে বাইরে*, *যোগাযোগ*, *শেষের কবিতা*;
ছোটগল্প	:	*গল্পগুচ্ছ*, *তিনসঙ্গী*, *গল্পসল্প*;
নাটক	:	*বিসর্জন*, *রাজা*, *অচলায়তন*, *ডাকঘর*, *রক্তকরবী*;
প্রবন্ধ	:	*আধুনিক সাহিত্য*, *মানুষের ধর্ম*, *কালান্তর*, *সাহিত্যের স্বরূপ*;
আত্মজীবনী	:	*জীবনস্মৃতি*, *ছেলেবেলা*।

ভূমিকা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাণ' কবিতাটি 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। এই কবিতায় স্বীয় সৃষ্টিকর্মের মধ্যে দিয়ে মানুষের মাঝে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। মানব কল্যাণে আত্মনিয়োগের মাধ্যমেই অমরত্ব লাভ করা সম্ভব। আর মানুষের মাঝে চিরস্মরণীয় থাকার জন্য প্রয়োজন মহৎ সৃষ্টির দৃঢ় সংকল্প।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- জীবনের সার্থকতা সম্পর্কে কবির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কবি ও কবিতার কাজ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই !
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রুময় –
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয় !

তা যদি না পারি, তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।
হাসি মুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায় ॥

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অমর আলয়– অমর সৃষ্টি অর্থে। **কানন–** বাগান। ***চিরতরঙ্গিত–*** সর্বদা কল্লোলিত; বহমান। ***জীবন্ত হৃদয় মাঝে–*** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সমস্ত সৃষ্টিতে মানুষের মাঝে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য অংশে তাঁর এই আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। **ঠাঁই–** ঠিকানা; স্থান। ***নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই–*** রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির জগৎ বিপুল; মানুষের জীবনের বিচিত্র অনুভব-অনুভূতি, ভাব-ভাবনা ও কর্মের জগৎকে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রাণময় করে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর সেই সৃষ্টির মধ্য থেকে রূপ-রস-গন্ধ যেন মানুষ অনুভব করতে পারে তার জন্য তিনি প্রতিনিয়ত ফুটিয়ে তুলছেন সৃষ্টির কুসুম। ***বিরহমিলন কত হাসি-অশ্রুময়–*** মানুষের জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। হাসি-কান্না; আনন্দ-বেদনা নিয়ে তার জীবন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানব জীবনের এই বৈচিত্র্যের মধ্যে স্থান করে নিতে চেয়েছেন। আর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন যাপিত জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার বিপুল এক আখ্যান। **ভুবনে–** পৃথিবীতে; ধরায়। ***লভি–*** লাভ করি। ***সূর্য করে–*** সূর্যের আলোতে।

সারসংক্ষেপ :

দুনিয়াটা সুন্দর। এই সুন্দর ছেড়ে কবি মরতে চান না। তিনি মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকতে চান। মানুষের জীবন হাসি-কান্নায় ভরপুর। কবি তাঁর কাব্যে জীবনের এই বৈচিত্র্যকে অমর রূপ দিয়ে মানুষের চিরন্তন ভালোবাসা পেতে চান। অমর কাব্য না লিখতে পারলেও ক্ষতি নেই। যতদিন তাঁর কাব্যের প্রাসঙ্গিকতা থাকবে, ততদিন যেন মানুষ সেগুলো গ্রহণ করে– এই কবির একান্ত চাওয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'প্রাণ' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?
   ক. কড়ি ও কোমল খ. বনফুল
   গ. সোনার তরী ঘ. শেষের কবিতা

২. 'অমর আলয়' বলতে বোঝানো হয়েছে–

ক. সূর্যের আলো অর্থে
খ. সুরধ্যান অর্থে
গ. অমর সৃষ্টি অর্থে
ঘ. সুরবাণী অর্থে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

সংসারে বিদায় দিতে, আঁখি ছলছলি
জীবন আঁকড়ি ধরি আপনার বলি
দুই ভুজে ॥

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে নিচের কোন কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে?
ক. প্রাণ
খ. জীবন সঙ্গীত
গ. পল্লিজননী
ঘ. বাংলা শব্দ

৪. উদ্দীপক ও আপনার পঠিত কবিতায় মিল রয়েছে যে বিষয়ে–
i. ভাবে
ii. আঙ্গিকে
iii. বিষয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. ii
গ. i, ii
ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?
ক. ১৯১১
খ. ১৯১২
গ. ১৯১৩
ঘ. ১৯১৪

৬. 'প্রাণ' কবিতায় কবি কোথায় স্থান পেতে চেয়েছেন?
ক. সূর্যকরে
খ. পুষ্পিত কাননে
গ. নবসঙ্গীতে
ঘ. মানবের মাঝে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আমি চিরতরে দূরে চলে যাব
তবু আমারে দেব না ভুলিতে।

৭. উদ্দীপকের ভাবের সঙ্গে নিচের কোন চরণের মিল রয়েছে?
i. এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই!
ii. পরশ তাহার মায়ের স্নেহের মতো
ভুলায় খানিক মনের ব্যথা যত!
iii. পাক্কা নতুন টাটকা ওষুধ এক্কেবারে দিশি–
দাম করেছি শস্তা বড়, চোদ্দ আনা শিশি।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii

৮. যে কারণে উদ্দীপক ও সাদৃশ্যপূর্ণ চরণে মিল দেখা যায়–
ক. সৃষ্টির আনন্দ
খ. খ্যাতি লাভের আকাঙ্ক্ষা
গ. সম্পত্তির লোভ
ঘ. ক্ষমতা ভোগের আকাঙ্ক্ষা

সৃজনশীল প্রশ্ন :

এ কথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর শাজাহান
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।
শুধু তব অন্তর বেদনা
চিরন্তন হয়ে থাক,
শুধু থাক
সম্রাটের ছিল এ সাধনা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল, এ তাজমহল।

ক. 'বনফুল' কাব্যগ্রন্থটি কত সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
খ. 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।' –কবি একথা বলেছেন কেন?
গ. উদ্দীপকটি 'প্রাণ' কবিতার কোন বিষয়টিকে প্রকাশ করে? –ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকের শাজাহান এবং 'প্রাণ' কবিতায় কবির অনুভূতি একই সূত্রে গাঁথা।" –মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বনফুল' কাব্যগ্রন্থটি ১৮৭৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

খ. হাসি, আনন্দ, সুখ-দুঃখে ঘেরা এই সুন্দর আকর্ষণীয় পৃথিবী ছেড়ে কবি কিছুতেই চলে যেতে চান না।
পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা চিরন্তন। যদিও এটা সকলেই জানেন মানুষ মরণশীল। এই সুন্দর আকর্ষণীয় পৃথিবীতে মানুষ আসেই পুনরায় চলে যাওয়ার জন্য। তবুও মানুষ এ ধরণীতে বাঁচতে চায়, কিছুতেই হারিয়ে যেতে চায় না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও চান না এ পৃথিবীর মাঝ থেকে হারিয়ে যেতে, চান না মরে যেতে। তিনি পৃথিবীর মানুষের হৃদয় ও প্রকৃতির অপরূপ রূপ-লাবণ্য দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে চান। এভাবে তিনি মহৎ কর্ম সৃষ্টি করে মানবের হৃদয়ে আজীবন বেঁচে থাকতে চান। বস্তুত 'প্রাণ' কবিতায় একথাই তিনি উক্ত চরণটি দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন।

গ. উদ্দীপকে নিজের সৃষ্টির মাধ্যমে বেঁচে থাকার প্রত্যাশাই 'প্রাণ' কবিতাটিতে প্রকাশিত হয়েছে।
রূপ-রস-আনন্দে ভরপুর এই জগত সুন্দর ও আকর্ষণীয়। মানুষ এখানে নিয়ত সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে ও টিকে থাকতে। আবেগ ও ভালোবাসায়, মান ও অভিমানে, হাসি ও কান্নায় পূর্ণ এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই যেন আনন্দের। কেউই চায় না এই মায়াবী পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্ব চিরকালের জন্য বিলীন করে দিতে।
'প্রাণ' কবিতাটিতে কবিমনের এক সুন্দর আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হয়েছে। পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে কবি অন্য কিছুর আহ্বানে প্রলুব্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে চান না। তাই তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন, কালজয়ী রচনা সৃষ্টির মাধ্যমে জগতের নিকট আদৃত হওয়ার। উদ্দীপকের কবিতাংশটুকুতে সম্রাট শাহজাহানের মনের যে বাসনা ব্যক্ত হয়েছে তা 'প্রাণ' কবিতায় প্রকাশিত কবির মনোভাবেরই একটু ভিন্নরূপ। সম্রাট শাহজাহান জানেন সময়ের কালস্রোতে জীবন-যৌবন-ধন-মান একদিন সবই লুপ্ত হয়ে যাবে। তাই তিনি চেয়েছেন নিজের আপনজন হারানোর বেদনাটি যেন জগতের মানুষ সহজে ভুলে না যায় সেজন্য কিছু সৃষ্টি করতে। আর এর প্রত্যক্ষ ফসল আগ্রায় সৃষ্ট অমর তাজমহল। উদ্দীপকে বর্ণিত সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে নিজের অমরত্বের আকাঙ্ক্ষাই 'প্রাণ' কবিতাটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের শাহজাহান এবং 'প্রাণ' কবিতার কবির অনুভূতি একসূত্রে গাঁথা।
মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। জন্মগ্রহণ করলে তাকে একসময় মৃত্যুবরণ করতে হবে। জীবনের এই ধ্রুব সত্যটি সকলের জানা। তবুও মানব মনের বাসনা যে, সে পৃথিবীতে মানুষের মাঝে অমর হয়ে থাকবে। যেহেতু দৈহিকভাবে মানুষের অবিনশ্বর হওয়া সম্ভব নয়, তাই আপন সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে মানুষের মনে জাগরূক হয়ে থাকতে পারাটাই হচ্ছে এ অমরতা।
'প্রাণ' কবিতাটিতে কবি রবীন্দ্রনাথ নিজ সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে মানুষের মাঝে বেঁচে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি মানব জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের মাঝে নিজের স্থান করে নিতে চেয়েছেন। তাই কবি মানব জীবনের বিচিত্র

অনুভব-অনুভূতি, ভাব-ভাবনা ও কর্মের জগতকে আপন সৃষ্টির মধ্যে প্রাণময় করে তোলার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। কবির অবর্তমানে মানুষ যেন জীবনের রূপ-রস-গন্ধ অনুভব করতে পারে সেজন্যই তিনি রচনা করেছেন তার নব নব সৃষ্টির ডালি। উদ্দীপকে সম্রাট শাহজাহানের জীবনের আকাঙ্ক্ষাও তাই। তিনি জানেন সময়ের কালপ্রবাহে তার পায়ে চলার স্মৃতিটুকুও মুছে যাবে। তাই তিনি সৃষ্টি করেছেন অমর তাজমহল। সম্রাট শাহজাহান যেদিন পৃথিবীতে থাকবেন না, সেদিন তার তাজমহল পৃথিবীর বুকে টিকে থাকবে। তিনিও পৃথিবীর মানুষের মনে জাগরূক থাকবেন, পৃথিবীর অনাগত কালের মানুষ জানবে তার অব্যক্ত হৃদয়ের গোপন কথা।

অতএব, দেখা যাচ্ছে 'প্রাণ' কবিতায় কবি যেমন আপন সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে মানুষের জীবনে বেঁচে থাকতে চেয়েছেন ঠিক তেমনি উদ্দীপকেও সম্রাট শাহজাহান আপন সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে নিজের মনোবেদনাকে আবহমান কালের পৃথিবীতে বর্তমান করে যেতে চেয়েছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শাহজাহান এবং 'প্রাণ' কবিতায় কবির অনুভূতি একইসূত্রে গাঁথা।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

প্রাণিমাত্রই মরণশীল। জন্ম মানেই মৃত্যুকে স্বীকার করে নেওয়া। তবু মানুষ এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে বেঁচে থাকতে চায়। সে সূর্যের আলোতে, ফুলের সমারোহে ও সৌন্দর্যে পৃথিবীতে নিজের স্থান করে নেয়। পৃথিবীর সমস্ত সুন্দরকে ছেড়ে সে অন্ধকারে হারাতে চায় না। তার প্রজ্ঞা, মেধা ও বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে জীবনকে সার্থক করে তুলতে চায়। অন্য কথায় বলা যায়, মানবের অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা চিরকালীন।

ক. 'চিরতরঙ্গিত' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।' –কথাটির মানে কী?

গ. উদ্দীপকটি 'প্রাণ' কবিতার সাথে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. 'প্রাণ' কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে। –বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক	২. গ	৩. ক	৪. ঘ	৫. গ	৬. ঘ	৭. ক	৮. ক

অডিও/ভিডিও

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বর্তমানে বিটিভি/বংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।

শিক্ষার্থীবন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

অন্ধবধূ

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

কবি-পরিচিতি

কবি ও সাংবাদিক যতীন্দ্রমোহন বাগচী ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর নদীয়া জেলার জমশেরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস হুগলি জেলার বলাগড় গ্রামে। কলকাতার ডাফ কলেজ থেকে ১৯০২ সালে তিনি বিএ পাস করেন। বিভিন্ন চাকরির পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেও তিনি কাজ করেন। একসময় তিনি নাটোরের মহারাজার সচিব ছিলেন। সমকালীন অনেক সাহিত্যিক পত্রিকা তাঁর দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। যতীন্দ্রমোহন রবীন্দ্রোত্তর যুগের শক্তিমান কবিদের মধ্যে অন্যতম। পল্লিপ্রকৃতির সৌন্দর্য ও পল্লিজীবনের হাসি-কান্না তাঁর কবিতার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। গ্রাম-বাংলার শ্যামল স্নিগ্ধ রূপ উন্মোচনে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন। গ্রামের অতি সাধারণ জীবনের সুখ-দুঃখের কথা সহজ-সরল ভাষায় তাঁর কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। ভাগ্যবিড়ম্বিত ও নিপীড়িত নারীদের কথা তিনি বিশেষ দরদের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। 'কাজলাদিদি' ও 'অন্ধবধূ' তাঁর এ ধরনের দুটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : *লেখা*, *রেখা*, *অপরাজিতা*, *বন্ধুর দান*, *জাগরণী*, *নীহারিকা*, *মহাভারতী*;

কবিতা : কাজলাদিদি, অন্ধবধূ।

ভূমিকা

আত্মকথনমূলক সংলাপের আদলে রচিত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'অন্ধবধূ' কবিতায় একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষের অনুভূতিলোকের পরিচয় এবং তাদের প্রতি সমাজের নির্মমতা তুলে ধরা হয়েছে। দৃষ্টিহীনদের অসহায় জীবনযাপনের সংবেদনশীলতায় ও অনুভূতির মধ্যে দিয়ে সে যে জগতের রূপ-রস-গন্ধ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে তা সুস্পষ্টভাবে কবি উপস্থাপন করেছেন। তারা নৈরাশ্যবাদী নয়; বরং জীবনের প্রতি তাদের গভীর মমত্ববোধ আছে এবং তা আপনজনের মমত্ব প্রত্যাশা করে। তাই এই কবিতায় সুনিপুণ ভাবে ফুটে উঠেছে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- অন্ধ নারীর করুণ জীবনের প্রতি কবির সহানুভূতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- দৃষ্টিহীনরা অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কীভাবে জীবন ও জগতের সাথে সম্পর্কিত থাকে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

পায়ের তলায় নরম ঠেকল কী!
আস্তে একটু চল না ঠাকুরঝি –
ওমা, এ যে ঝরা-বকুল! নয়?
তাইতো বলি, বসে দোরের পাশে,
রাত্তিরে কাল– মধুমদির বাসে
আকাশ-পাতাল– কতই মনে হয়।

জ্যৈষ্ঠ আসতে ক-দিন দেরি ভাই –
আমের গায়ে বরণ দেখা যায়?
– অনেক দেরি? কেমন করে হবে!
কোকিল-ডাকা শুনেছি সেই কবে,
দখিন হাওয়া – বন্ধ কবে ভাই;
দীঘির ঘাটে নতুন সিঁড়ি জাগে –
শ্যাওলা-পিছল – এমনি শঙ্কা লাগে,
পা-পিছলিয়ে তলিয়ে যদি যাই!

মন্দ নেহাত হয় না কিন্তু তায় –
অন্ধ চোখের দ্বন্দ্ব চুকে যায়!

দুঃখ নাইকো সত্যি কথা শোন,
অন্ধ গেলে কী আর হবে বোন?
বাঁচবি তোরা – দাদা তো তোর আগে?
এই আষাঢ়েই আবার বিয়ে হবে,
বাড়ি আসার পথ খুঁজে না পাবে –
দেখবি তখন – প্রবাস কেমন লাগে?

'চোখ গেল' ওই চেঁচিয়ে হলো সারা।
আচ্ছা দিদি, কী করবে ভাই তারা–
জন্ম লাগি গিয়েছে যার চোখ!
কাঁদার সুখ যে বারণ তাহার – ছাই!
কাঁদতে পেলে বাঁচত সে যে ভাই,
কতক তবু কমত যে তার শোক।

'চোখ গেল'– তার ভরসা তবু আছে–
চক্ষুহীনার কী কথা কার কাছে!

টানিস কেন? কিসের তাড়াতাড়ি–
সেই তো ফিরে যাব আবার বাড়ি,
একলা-থাকা- সেই তো গৃহকোণ–
তার চেয়ে এই স্নিগ্ধ শীতল জলে
দুটো যেন প্রাণের কথা বলে–
দরদ-ভরা দুখের আলাপন;

পরশ তাহার মায়ের স্নেহের মতো
ভুলায় খানিক মনের ব্যথা যত!

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অন্ধ চোখের দ্বন্দ্ব চুকে যাক– অন্ধবধূ অনুভবঋদ্ধ মানুষ। আত্মমর্যাদা বোধেও সে সমৃদ্ধ। কিন্তু সে অন্ধ। এই অন্ধত্বের কষ্ট সে গভীরভাবে অনুভব করে। দীঘির ঘাটে যখন শেওলা পড়া পিছল সিঁড়ি জাগে তখন সে পিছল খেয়ে জলে পড়ে ডুবে মরার আশঙ্কা প্রকাশ করে। আর এও অনুভব করে যে, ডুবে মরলে অন্ধত্বের অভিশাপ ঘুচত। কিন্তু কবিতাটির চেতনা থেকে মনে হয়, অন্ধবধূ নৈরাশ্যবাদী মানুষ নয়। জীবনের প্রতি তার গভীর মমত্ববোধ আছে। **অন্ধবধূ জ্ঞান রাখে–** জগতের রূপ-রস-গন্ধ সম্পর্কে এবং অনুভূতিগ্রাহ্য বস্তু সম্পর্কে জানে। ***আকাশপাতাল–*** নানা বিষয়; নানান ভাবনা-অনুভাবনা অর্থে ব্যবহৃত। **আলাপন–** কথোপকথন। **কতক–** কিছু; কিয়দংশ। ***কাঁদার সুখ–*** মানুষ দুঃখে কাঁদে, শোকে কাঁদে। কিন্তু কান্নার মধ্য দিয়ে তার দুঃখ-শোকের লাঘব ঘটে; তাই কান্নার মধ্যেও সুখ অনুভব করা যায়। **চুকে–** মিটে যাওয়া। ***চোখ গেল–*** পাখি বিশেষ। এই পাখির ডাক 'চোখ গেল' শব্দের মতো মনে হয়। ***জ্যৈষ্ঠ আসতে ক-দিন দেরি ভাই...–*** একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষের অনুভবের অসাধারণ এক জগৎ আলোচ্য অংশে ব্যক্ত হয়েছে। প্রকৃতির বিচিত্র রঙের ধারণা ও অনুভবে এই অন্ধবধূ সমৃদ্ধ। সেই জ্ঞান ও অনুভব থেকে সে জেনে নিতে চায় ঋতুর বিবর্তন। ***ঠাকুরঝি–*** ননদ, স্বামীর বোন, শ্বশুরকন্যা। **তলিয়ে–** ডুবে। **দখিন হাওয়া–** দক্ষিণ দিকের বাতাস। **দোর–** দরজা। **নেহাত–** নিতান্ত, নিদেনপক্ষে। **পরশ–** স্পর্শ। **প্রবাস–** নির্বাসন, বিদেশ। **বারণ–** নিষেধ, মানা। **বাসে–** সুগন্ধে। ***মধুমদির বাসে–*** মধুর গন্ধে মোহময়।

সারসংক্ষেপ :

বধূটি অন্ধ। অন্ধ হলেও তার অন্য ইন্দ্রিয়গুলো প্রখর। পায়ের নিচে পড়া বকুল ফুল, কোকিলের ডাক, দখিনা হাওয়া, পিচ্ছিল সিঁড়ি ইত্যাদি সে গভীরভাবে অনুভব করে। এভাবে সে সম্পর্কিত থাকে সময় ও প্রকৃতির সঙ্গে। কিন্তু অন্ধ জীবনের দুর্গতিও কম নয়। তার ধারণা, সে অন্ধ বলেই স্বামী বিদেশ থেকে দেশে আসে না। বারবার মৃত্যুর ইচ্ছা জানিয়ে সে তার অভিমানী মনের বেদনাই প্রকাশ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পায়ের তলায় নরম ঠেকেছিল কোনটি?
ক. ঝরা গোলাপ খ. ঝরা বকুল গ. ঝরা মালতী ঘ. ঝরা কদম

২. 'অন্ধবধূর শোকের বোঝা' যেভাবে হালকা হয়েছে–
ক. কাঁদতে পেরে খ. বাপের বাড়ি যেতে পেরে
গ. স্বামীকে কাছে পেয়ে ঘ. গান শুনতে পেয়ে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

সুভা যে বিধাতার অভিশাপস্বরূপে তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে একথা সে শিশুকাল হইতে বুঝিয়া লইয়াছিল। তাই বলিয়া সে জীবনকে তুচ্ছ মনে করে নাই। গৃহকর্মে তাহার অখণ্ড মনোযোগ। শুধু তাহাই নয় প্রকৃতির সঙ্গে সে পাতিয়া নিয়াছিল মিতালি।

৩. উদ্দীপকের সুভা ও 'অন্ধবধূ' কবিতার বধূর অমিল যেখানে–
ক. জীবন ভাবনায় খ. অর্থ-সম্পদে গ. গায়ের রঙে ঘ. সমাজ নীতিতে

৪. উদ্দীপকের সুভা ও অন্ধবধূর মিতালি রয়েছে যে বিষয়ে-
i. প্রকৃতিপ্রেমে ii. আবেগ প্রকাশে iii. অধিকার আদায়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'চোখ গেল' শব্দের অর্থ কী?

ক. লজ্জা খ. রাগ গ. পাখি ঘ. ফুল

৬. 'অন্ধবধূ' কাঁদতে পারলে কী হতো?

i. দুঃখ লাঘব হত ii. শোক কম হত iii. রাগ বেড়ে যেত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও ii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

অর্ণব দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। তাহার জীবনের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হইয়া আছে। সাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে সর্বদাই চেষ্টা করিত। মনে করিত,আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে 'অন্ধবধূ' কবিতার যে চরিত্রটির মিল রয়েছে–

i. অন্ধবধূ ii. দাদা iii. ঠাকুরঝি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. উপরের কোনটিই নয়

৮. উদ্দীপক ও 'অন্ধবধূ' কবিতায় সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে–

ক. রাগ খ. ঘৃণা গ. অবহেলা ঘ. আনন্দ

সৃজনশীল প্রশ্ন :

আমাদের সমাজ ও সংসারে প্রতিবন্ধীদেরকে ছোট করে দেখা হয়, মনে করা হয় তারা বোঝা। এটা করা উচিত নয়, কেননা তারাও মানুষ। প্রতিবন্ধী মানুষকে অবজ্ঞা করলে তাদের দুঃখ আরো বেড়ে যায়। আমাদের উচিত তাদের ভালোবাসা, তাদের যথোপযুক্ত মূল্য দেয়া। নির্মল পরিবেশ পেলে তারাও মেধার বিকাশ ঘটাতে পারে। এমনকি তারা হয়ে উঠতে পারে বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব। একটি সুন্দর সমাজ গড়ার জন্য তাদের সঙ্গে আমাদের ভালোবাসা ও মমত্বময় সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন।

ক. সমাজ কাদের অবজ্ঞা করে?

খ. 'বাঁচবি তোরা – দাদা তো তার আগে?' –অন্ধবধূ একথা বলেছে কেন?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'অন্ধবধূ' কবিতার সাদৃশ্য কিংবা বৈসাদৃশ্য আপনার নিজের ভাষায় তুলে ধরুন।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'অন্ধবধূ' কবিতার আংশিক ভাব ধারণ করেছে।" – মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. সমাজ দৃষ্টিহীনদের অবজ্ঞা করে।

খ. অন্ধবধূ মনে করে অন্ধ বলে সে সকলের নিকট বোঝা। তাই মনের দুঃখে সে আলোচ্য উক্তিটি করেছে।

সমাজে ও সংসারে দৃষ্টিহীন বলে অন্ধবধূ নিজেকে খুব অসহায় মনে করে। তার ধারণা যে নিজের সংসারেও সে উপেক্ষিত। সে নিজেকে সংসারে একটি বোঝা বলে মনে করে। তার ধারণা সে মরে গেলে তার স্বামী, ঠাকুরঝি সবাই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে। এসব কথা মনে করে সে ঠাকুরঝির উদ্দেশ্যে উক্তিটি করেছে।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'অন্ধবধূ' কবিতার সাদৃশ্য নয়, বৈসাদৃশ্য রয়েছে। অন্ধবধূর প্রতিবন্ধকতা জয় করতে না পারার বিষয়টিই উদ্দীপকের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হয়েছে।

প্রতিবন্ধীরা আমাদের সমাজে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ। সমাজে চলতে গেলে তাদের অন্যান্য মানুষের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনীয় সুযোগ এবং যথেষ্ট পরিমাণ সহায়তা পেলে তারাও প্রতিবন্ধী অবস্থা কাটিয়ে সমাজের অন্য কর্মক্ষম মানুষের মতো হয়ে উঠতে পারে।

আমাদের আলোচ্য 'অন্ধবধূ' কবিতায় অন্ধবধূ একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হলেও সে প্রকৃতিপ্রেমী। সে তার অনুভবের সাহায্যে পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। কিন্তু সে সমাজের একজন কর্মক্ষম মানুষ নয়। নিজের প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে সে সমাজের স্বাভাবিক মানুষের মত সক্ষম বা ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারে নি। অন্যদিকে উদ্দীপকটিতে এর বিপরীত চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রতিবন্ধীরা যথাযথ মনোযোগ ও সহায়তা পেলে দুঃখের অন্ধকার ছেড়ে আলোকিত জীবনের অধিকারী হতে পারে। এমনকি তারা হয়ে উঠতে পারে বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব । সে কথাও রয়েছে উদ্দীপকে। তাই বলা যায় 'অন্ধবধূ' কবিতায় অন্ধবধূর শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করতে না পারার ব্যর্থতাটাই উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয় নি।

ঘ. সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিবন্ধীরা পর্যাপ্ত সুযোগ পেলে নিজেদের স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত করে তুলতে পারে।

সমাজে প্রতিবন্ধীরা স্বাভাবিক মানুষের মতো নয়। তাদেরকে অবহেলা না করে আমাদের বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা উচিত। কেননা সকলের সহযোগিতা পেলে এই বিশেষ ধরনের মানুষগুলো নিজেদের মেলে ধরতে পারে। তারাও দুঃখের অন্ধকার ছেড়ে আলোকিত জীবনের অধিকারী হতে পারে।

'অন্ধবধূ' কবিতায় অন্ধবধূ জন্ম থেকেই অন্ধ। আবার সে পল্লিগ্রামে মানুষ। অবশ্য অন্ধবধূ যথেষ্ট অনুভূতি সম্পন্ন মানুষ। তবু তার জীবন স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয় নি। ফলে সে স্বনির্ভর নয়। তার জীবন দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ। স্বামীর প্রতীক্ষা,প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকা কিংবা গৃহকোণ তার জীবনের অনুষঙ্গ। অন্যদিকে উদ্দীপকটিতে ফুটে উঠেছে 'অন্ধবধূ' কবিতার বিপরীত দিকগুলো। উদ্দীপকে বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধীদের মূল্যায়ন করতে হবে। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে তারাও মেধার বিকাশ ঘটাতে পারে। আর আমাদের উচিত হবে প্রতিবন্ধীদের প্রতি ভালোবাসা আর সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া।

প্রতিবন্ধীদের অবজ্ঞার চোখে দেখা উচিত নয়। তারাও অন্যদের মতো বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। সে জন্য প্রয়োজন প্রতিবন্ধীদের প্রতি বেশি করে ইতিবাচক মনোভাব দেখানো। উপরিউক্ত আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, 'অন্ধবধূ' কবিতাটি উদ্দীপকের আংশিক চেতনা ধারণ করেছে।' –মন্তব্যটি যথার্থ।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

হে কবি নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়,
বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়,
কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি–
"দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?"

ক. যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিমানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?

খ. 'অন্ধ চোখের দ্বন্দ্ব' –কথাটি বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকটি 'অন্ধবধূ' কবিতার কোন অংশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? – ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. "অন্ধবধূ' কবিতাটির সামগ্রিক অংশ নয়, একটি বিশেষ দিক উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে।" –আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. ক ৩. ক ৪. ক ৫. গ ৬. ঘ ৭. ক ৮. গ

ঝরনার গান

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কবি-পরিচিতি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতার কাছে নিমতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক বাংলা-গদ্যের প্রাণপুরুষ ও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন তাঁর পিতামহ। পাণ্ডিত্যের একটি প্রবল ঝোঁক উত্তরাধিকার-সূত্রে তিনি তাঁর পিতামহের নিকট থেকে পেয়েছিলেন। তাঁর এ পাণ্ডিত্যের ছাপ অনেক কবিতার মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা যখন মধ্যগগনে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের তখন আবির্ভাব। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রভাববলয়ের বাইরেও একটি স্বতন্ত্র কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন; যে কারণে, তিনি বাংলা কাব্য জগতে সমাদৃত হয়ে আছেন। কবিতার ছন্দ ও রূপের নৈপুণ্যের জন্য তিনি ছন্দের যাদুকর হিসেবে বাংলার কাব্য জগতে পরিচিত। সাধারণ মানুষ যেমন তাঁর কাব্যের উপজীব্য; তেমনি আবার অতি সাধারণ দেশজ শব্দ, বিলুপ্তপ্রায় শব্দ ব্যবহার করে তিনি ভাষার শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর কবিতা শব্দনির্মাণ কৌশল, শব্দ ও ভাষা ব্যবহারের কারুকার্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বাংলা কাব্য সাহিত্যে অনুবাদের পথিকৃৎ হিসাবেও তিনি স্বীকৃত। তিনি আরবি, ফারসি, চিনা, জাপানি, ইংরেজি, ফরাসি ও উপমহাদেশের বহু ভাষা থেকে কবিতা অনুবাদ করেছেন। তাঁর 'কাব্য সঞ্চয়ন' নামে একটি কবিতা সংগ্রহ আছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুন মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : *সবিতা*, *সন্ধিক্ষণ*, *বেণু ও বীণা*, *হোমশিখা*, *কুহু ও কেকা*, *অভ্র আবীর*, *বেলা শেষের গান*, *বিদায় আরতী*।

অনূদিত কাব্যগ্রন্থ : *তীর্থরেণু*, *তীর্থ-সলিল*, *ভুলের ফসল*।

ভূমিকা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রকৃতি বিষয়ক 'ঝরনার গান' কবিতাটিতে কবি প্রকৃতির বিচিত্র অনুষঙ্গের রূপ সৌন্দর্যের তুলনা, পাহাড়ি প্রকৃতি ও পরিবেশের সম্পর্ক এবং পাহাড়ি ঝরনার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিচয় তুলে ধরেছেন। কবি এই কবিতায় ঝরনার চঞ্চল গতিময়তা, চমৎকার ধ্বনি-মাধুর্য এবং নিথর পাথরের বুকে পদচিহ্ন রেখে যাওয়া মনোমুগ্ধকর ও মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য অবলোকনে কবি মানসিক শান্তি ও কর্মস্পৃহাকে শাণিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- ঝরনার চলার গতি ও পথের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- কবিতার ছন্দ ও অলঙ্কারের সৌন্দর্য সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

চপল পায় কেবল ধাই,
কেবল গাই পরীর গান,
পুলক মোর সকল গায়,
বিভোল মোর সকল প্রাণ।
শিথিল সব শিলার পর
চরণ থুই দোদুল মন,
দুপুর-ভোর ঝিঁঝিঁর ডাক,
ঝিমায় পথ, ঘুমায় বন।
বিজন দেশ, কূজন নাই
নিজের পায় বাজাই তাল,
একলা গাই, একলা ধাই,
দিবস রাত, সাঁঝ সকাল।
ঝুঁকিয়ে ঘাড় ঝুম-পাহাড়
ভয় দ্যাখায়, চোখ পাকায়;
শঙ্কা নাই, সমান যাই,
টগর-ফুল-নূপুর পায়,
কোন গিরির হিম ললাট
ঘামল মোর উদ্ভবে,
কোন পরীর টুটুল হার
কোন নাচের উৎসবে।
খেয়াল নাই-নাই রে ভাই
পাই নি তার সংবাদই,
ধাই লীলায়, –খিলখিলাই–
বুলবুলির বোল সাধি।
বন-ঝাউয়ের ঝোপগুলায়
কালসারের দল চরে,
শিং শিলায়-শিলার গায়,
ডালচিনির রং ধরে।
ঝাঁপিয়ে যাই, লাফিয়ে ধাই,
দুলিয়ে যাই অচল-ঠাঁট,
নাড়িয়ে যাই, বাড়িয়ে যাই–
টিলার গায় ডালিম-ফাট।
শালিক শুক বুলায় মুখ
থল-ঝাঁঝির মখমলে,
জরির জাল আংরাখায়
অঙ্গ মোর ঝলমলে।
নিম্নে ধাই, শুনতে পাই
'ফটিক জল।' হাঁকছে কে,
কণ্ঠাতেই তৃষ্ণা যার
নিক না সেই পাঁক ছেঁকে।

গরজ যার জল স্যাঁচার
পাতকুয়ায় যাক না সেই,
সুন্দরের তৃষ্ণা যার
আমরা ধাই তার আশেই।
তার খোঁজেই বিরাম নেই
বিলাই তান–তরল শেণ্ঢাক,
চকোর চায় চন্দ্রমায়,
আমরা চাই মুগ্ধ-চোখ।
চপল পায় কেবল ধাই
উপল-ঘায় দিই ঝিলিক,
দুল দোলাই মন ভোলাই,
ঝিলমিলাই দিগ্বিদিক।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

আংরাখা– লম্বা ও ঢিলা পোশাক বিশেষ। **উদ্ভব–** উৎপন্ন, জন্ম। **উপল-ঘায়**– পাথরের আঘাতে। **কূজন**– পাখির ডাক।, **গরজ–** দরকার; প্রয়োজন। **গিরি–** পাহাড়; পর্বত। ***চকোর***– পাখি বিশেষ, কবি-কল্পনা অনুযায়ী এই পাখি চাঁদের আলো পান করে। **চন্দ্রমা**– চাঁদের আলো। **চপল–** অস্থির; চঞ্চল। **ঝাঁঝি**– এক প্রকার জলজ গুল্ম; বহুদিন ধরে জমা শেওলা। ***ঝুম-পাহাড়***– নীরব পাহাড়; নির্জন পাহাড়। ***তরল শ্লোক***– লঘু বা হালকা চালের কবিতা। ***তান***– সুর। ***থল***– স্থল। **ধাই–** দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া; ধাওয়া। **পাতকুয়া–** কাঁচা কুয়া; ছোট কুয়া। **পুলক-** শিহরণ। ***'ফটিক জল'***– চাতক পাখি ডাকলে 'ফটিক জল' শব্দের মতো শোনা যায়। ***বিজন***– নির্জন; জনশূন্য; নিভৃত। **বিভোল**– অচেতন; বিভোর; বিবশ; বিহবল। ***বিলাই***– বিতরণ করি; পরিবেশন করি (বিলোনো থেকে)। **বোধ-** অনুভূতি; উপলব্ধি। **বোল–** বুলি; কথা। ***মখমল***– কোমল ও মিহি কাপড়। **ললাট–** কপাল। ***শুক***– টিয়ে পাখি। **শিথিল–** শ্লথ; অবসন্ন; জড়তুল্য। **শিলা–** পাথর। **সাঁঝ–** সন্ধ্যা। **স্যাঁচার–** সেচন করার বা পানি তোলার যন্ত্র। ***হিম***– তুষার; বরফ।

সারসংক্ষেপ :

ঝরনার আছে গতির সৌন্দর্য। দূর পাহাড়ে জন্ম নিয়ে বিজন পথে সে একাকী ধেয়ে চলে। চলাতেই তার আনন্দ। আশপাশের দিকে নজর না দিয়েই সে ঝলমলে অঙ্গ নিয়ে ছুটে যায়। সে চায় না, তার স্বচ্ছ পানিতে কেউ পিপাসা মেটাক। সৌন্দর্যই তার মূল পরিচয়। তাই সে যেতে চায় তার কাছে, যার সুন্দর দেখার চোখ আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঝরনা কীসের গান করে?
ক. বুলবুলির খ. ঝিঁঝিঁর গ. শালিকের ঘ. পরির

২. ফটিক জলের কী হয়েছে?
ক. তৃষ্ণা পেয়েছে খ. ক্লান্তি পেয়েছে গ. ক্ষুধা লেগেছে ঘ. কষ্ট লেগেছে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

'ঝরনা। ঝরনা। সুন্দরী ঝরনা।
তরলিত চন্দ্রিকা। চন্দন বর্ণা।
অঞ্চল সিঞ্চিত গৌরিক স্বর্ণে,
গিরি মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে।'

৩. উদ্দীপকটির সঙ্গে নিচের কোন কবিতার মিল রয়েছে?

ক. প্রাণ খ. মানুষ গ. ঝরনার গান ঘ. সাঁকোটা দুলছে

৪. উদ্দীপক ও পাঠ্য কবিতায় যে বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে–

i. সৌন্দর্যময়তা ii. গতিময়তা iii. চঞ্চলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'ফটিক জল' কী?

ক. ফিঙ্গে পাখি খ. ময়না পাখি গ. চাতক পাখি ঘ. হুদহুদ পাখি

৬. 'ঝর্ণার গান' কবিতায় পাহাড় কীভাবে ঘুমায়?

ক. মুখোশ পরে খ. লাঠি নিয়ে গ. ঘাড় ঘুরিয়ে ঘ. ধমক দিয়ে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

চুনিয়া তো ভালোবাসে শান্তস্নিগ্ধ পূর্ণিমার চাঁদ,
চুনিয়া প্রকৃত বৌদ্ধ স্বভাবের নিরিবিলি সবুজ প্রকৃতি
চুনিয়া যোজনব্যাপী মনোরম আদিবাসী ভূমি।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে 'ঝর্ণার গান' কবিতাটির কোন বিষয়ে মিল রয়েছে?

ক. প্রকৃতি খ. মানুষ গ. ছন্দ ঘ. ভাব

৮. উদ্দীপক ও 'ঝরনার গান' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে–

ক. প্রকৃতির শাশ্বত আবেদন খ. প্রকৃতির রুক্ষতা
গ. প্রকৃতির মাদকতা ঘ. প্রকৃতির ভয়াবহতা

সৃজনশীল প্রশ্ন :

অনিন্দ্য সুন্দর দেশ বাংলাদেশ। এদেশের কোথাও পাহাড়, কোথাও সমুদ্র আবার কোথাওবা বিভোল চিত্তে ছুটে চলা ঝরনা। বাংলার এই সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য শুভ্র এবং তার বন্ধুরা সেবার ছুটে গিয়েছিল পার্বত্য জেলা বান্দরবানে। সেখানে তারা দেখেছে পাহাড়ের গা বেয়ে ছিটকে পড়া চলমান ঝরনার জলধারা। ঝরনার অবিরাম জলধারা মানব হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার করে। পতিত এ জলরাশির ধ্বনিমাধুর্য ও বর্ণবৈভব এককথায় অপূর্ব। শুভ্রর ভাবনায়, প্রকৃতির অমলিন সৌন্দর্যের আধার ঝরনা।

ক. বাংলা সাহিত্যে 'ছন্দের রাজা' বলে কে পরিচিত?

খ. 'শঙ্কা নাই, সমান যাই' –বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'ঝরনার গান' কবিতার সাদৃশ্যগুলো তুলে ধরুন।

ঘ. 'ঝরনার গান' কবিতার মূলভাব প্রকাশ করায় উদ্দীপকের সাফল্য বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা সাহিত্যে ছন্দের রাজা বলে পরিচিত।

খ. 'শঙ্কা নাই, সমান যাই' বলতে ঝরনার নির্ভয় ও শঙ্কাহীন চলার গতিকে বোঝানো হয়েছে।

প্রকৃতির বিচিত্র উপাদানে সমৃদ্ধ এ পৃথিবী। এর মধ্যে একটি অনিন্দ্য উপাদান ঝরনা। স্তব্ধ পাথরের বুকে এক আনন্দের চিহ্ন ঝরনা। দৈত্যের মতো ঘাড় ঘুরিয়ে ভয় দেখানো পাহাড় থেকে নেমে আসে ঝরনা। তার আনন্দময় পদধ্বনিতে পর্বত থেকে ধেয়ে আসে সাদা জলরাশির ধারা। চপলা, চঞ্চলা এ ঝরনা ভয় কাকে বলে জানে না। সে জানে না চলার গতি থামাতে বা কমাতে। তাই ঝরনা তার চলার এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছে, 'শঙ্কা নাই,সমান যাই'।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'ঝরনার গান' কবিতার নানা বিষয়ে মিল রয়েছে।

প্রকৃতি সৌন্দর্যের এক অনুপম আধার। সে তার নানা আয়োজনে পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, শৈলপ্রপাত, ঝরনা তার অন্যতম উদাহরণ।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার একটি ঝরনার সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে শুভ্র এবং তার বন্ধুরা দেখেছে পাহাড়ের গা থেকে ছিটকে পড়া চলমান ঝরনার অবিরাম ধারা। ঝরনার অনিকেত জলধারা তাদের মনে অনির্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার করেছে। তাদের কাছে এ ধ্বনিমাধুর্য ও বর্ণবৈভব অপূর্ব মনে হয়েছে। অন্যদিকে 'ঝর্ণার গান' কবিতায় ঝরনা নিজেই তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছে। সে চঞ্চল পায়ে পুলকিত গতিময়তায় স্তব্ধ পাথরের বুকে আনন্দের পদচিহ্ন এঁকে ছুটে চলে। সে পর্বত থেকে নেমে আসা আনন্দময় পদধ্বনির সাদা জলরাশির ধারা। গিরি থেকে পতিত এই অম্বুরাশি পাথরের বুকে আঘাত হেনে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে যে অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে তা সত্যিই মনোমুগ্ধকর। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সঙ্গে 'ঝরনার গান' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপক ও 'ঝরনার গান' কবিতা দুটিরই উপজীব্য প্রাকৃতিক উপাদান এবং এর সৌন্দর্য ও বর্ণবিভা।

পৃথিবীর প্রকৃতি জগতে ছড়িয়ে আছে বিচিত্র সব উপাদান। প্রত্যেকটি উপাদান তার আপন বৈশিষ্ট্যে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। এই স্বাতন্ত্র্যের কারণেই তা হয়েছে। উদ্দীপক এবং 'ঝরনার গান' কবিতায় আমরা দুটি ঝরনার কারুকার্যময় পথচলা এবং তার সৌন্দর্য উপভোগ করি।

উদ্দীপকে বান্দরবান জেলার একটি ঝরনার কথা বলা হয়েছে। এ ঝরনা পাহাড়ের গা থেকে ছিটকে পড়া একটি চলমান জলধারা। শুভ্র ও তার বন্ধুদের কাছে ঝরনাটির অবিরাম জলধারা অনির্বচনীয় আনন্দের উৎস হিসেবে ধরা দিয়েছে। তাদের কাছে ঝরনাটির ধ্বনিমাধুর্য ও বর্ণবৈভব মনোহর মনে হয়েছে। অন্যদিকে 'ঝরনার গান' কবিতায় ঝরনা তার আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে উঠেছে। এখানে ঝরনা চঞ্চলা চপলা গিরি নন্দিনী। তার পা পুলকিত গতিময়। সে যেন পাথরের বুকে আনন্দের চিহ্ন। এই ঝরনা পাহাড় থেকে আনন্দময় পদধ্বনিতে নেমে আসা এক চঞ্চল সাদা জলরাশির ধারা। এ জলধারার সৌন্দর্য এবং অমিয় স্বাদ তুলনারহিত।

উদ্দীপকে ঝরনার অপার্থিব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং এই সৌন্দর্য মানব মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তার বর্ণনা রয়েছে। উদ্দীপকের বর্ণনাতে পাওয়া যায় সৌন্দর্যপিপাসু মনের আত্মার খোরাক। অপরদিকে 'ঝরনার গান' কবিতায় ঝরনার চলার পথের যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তা ফুটে উঠেছে। পাহাড়, শিলা, বন, টিলা, বুলবুলি পাখি ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক উপাদানে পূর্ণ করে কবি তার কবিতাটিকে গড়ে তুলেছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'ঝরনার গান' কবিতার মূলভাব তুলে ধরতে সফল হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীকে বিচিত্র উপাদানে সজ্জিত করেছেন। এর অন্যতম নিদর্শন হল ঝরনা। ঝরনা পুলকিত গতিময় ছন্দে পৃথিবীর বুকে পদচিহ্ন এঁকে ছুটে চলে। তার চঞ্চল ও আনন্দময় পদধ্বনিতে পর্বত থেকে নেমে আসে সাদা জলরাশি। পাহাড় থেকে পতিত এই জলরাশি পৃথিবীর বুকে এক মোহনীয় আবেশ সৃষ্টি করে। সত্যিই, পৃথিবীর অনিন্দ্য সুন্দর এক উপাদান ঝরনা।

ক. 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কে?

খ. কেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে 'ছন্দের রাজা' বলা হয়?

গ. কোন দিক দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে 'ঝরনার গান' কবিতার মিল রয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকে 'ঝরনার গান' কবিতাটির একটি বিশেষ দিক প্রকাশিত হয়েছে, পুরো অংশের প্রতিফলন ঘটেনি।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘ	২. ক	৩. গ	৪. ঘ	৫. গ	৬. গ	৭. ক	৮. ক

মানুষ

কাজী নজরুল ইসলাম

কবি-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৫ মে (বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম দুখু মিয়া। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। নজরুল অল্প বয়সেই পিতামাতা দুজনকেই হারান। শৈশব থেকেই দারিদ্র্য আর দুঃখ-কষ্ট তাঁর সঙ্গী হয়েছিল। স্কুলের ধরাবাধা জীবনে কখনোই তিনি আকৃষ্ট হননি। ছেলেবেলায় তিনি লেটো গানের দলে যোগ দেন। পরে বর্ধমানে ও ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার দরিরামপুর হাইস্কুলে লেখাপড়া করেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে করাচিতে যান। যুদ্ধশেষে নজরুল কলকাতায় ফিরে আসেন ও সাহিত্যসাধনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯২১ সালে 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পর সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত হন। তাঁর লেখায় তিনি বিদেশি শাসক, সামাজিক অবিচার ও অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নজরুল সাহিত্য রচনা ছাড়াও প্রায় চার হাজার গানের রচয়িতা। তিনি বেশ কয়েকটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। তিনি গজল, খেয়াল ও রাগপ্রধান গান রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। আরবি-ফারসি শব্দের সার্থক ব্যবহার তাঁর কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ রচনায়ও তিনি কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। নজরুল ১৯৪০ সালের দিকে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ১৯৭২ সালে কবিকে ঢাকায় আনা হয়। তাঁকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডিলিট উপাধি প্রদান করেন। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

নজরুলের প্রধান রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : *অগ্নি-বীণা*, *বিষের বাঁশী*, *সাম্যবাদী*, *সর্বহারা*, *ফণিমনসা*, *ছায়ানট*;
উপন্যাস : *বাঁধনহারা*, *কুহেলিকা*, *মৃত্যুক্ষুধা*;
গল্প : *ব্যথার দান*, *রিক্তের বেদন*;
প্রবন্ধ : *যুগবাণী*, *রুদ্রমঙ্গল*, *দুর্দিনের যাত্রী*, *রাজবন্দীর জবানবন্দী*।

ভূমিকা

'মানুষ' কবিতাটি বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থ থেকে সম্পাদনা করে সংকলিত হয়েছে। কবিতাটিতে মানব সেবার মধ্য দিয়েই যে মনুষ্যত্বের বড় পরিচয় নিহিত রয়েছে তা উপস্থাপন করা হয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মহিমা, ধর্মগ্রন্থ ও আচার অনুষ্ঠানের চেয়ে মানুষের গুরুত্ব এবং সমাজের তথাকথিত মোল্লা পুরোহিতদের স্বরূপ উন্মোচন করে কবি তার সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করেছেন এই কবিতাতে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- সাম্যের ধারণার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ধর্মের বরাতে যারা মানুষের অধিকার লঙ্ঘন করে, তাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

গাহি সাম্যের গান –
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে সব কালে ঘরে–ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।

'পূজারী, দুয়ার খোলো,
ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে পূজার সময় হলো !'
স্বপন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়,
দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হয়ে যাবে নিশ্চয় !
জীর্ণ-বস্ত্র শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ–
ডাকিল পান্থ, 'দ্বার খোলো বাবা, খাইনি তো সাত দিন !'
সহসা বন্ধ হলো মন্দির, ভুখারি ফিরিয়া চলে,
তিমিররাত্রি, পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে !
ভুখারি ফুকারি' কয়,
'ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয় !'
মসজিদে কাল শিরনি আছিল, – অঢেল গোস্ত রুটি
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটি কুটি,
এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে আজারির চিন
বলে, 'বাবা, আমি ভুখা ফাকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন !'
তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা–'ভ্যালা হলো দেখি লেঠা,
ভুখা আছ মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে ! নমাজ পড়িস বেটা ?'
ভুখারি কহিল, 'না বাবা !' মোল্লা হাঁকিল–'তা হলে শালা
সোজা পথ দেখ !' গোস্ত-রুটি নিয়া মসজিদে দিল তালা।
ভুখারি ফিরিয়া চলে,
চলিতে চলিতে বলে–
'আশিটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু,
আমার ক্ষুধার অন্ন তা বলে বন্ধ করনি প্রভু।
তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি।
মোল্লা পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি !'
কোথা চেঙ্গিস, গজনি মামুদ, কোথায় কালাপাহাড় ?
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া দ্বার !
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা ?
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা !
হায় রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয় !

(সংক্ষেপিত)

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অভেদ– অভিন্ন; নির্বিশেষে। ***আজারি–*** রুগ্ণ; ব্যথিত। **কপাট–** দরজার পাল্লা। ***কালাপাহাড়–*** প্রকৃত নাম রাজচন্দ্র বা রাজকৃষ্ণ; রাজনারায়ণ; কারো কারো মতে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি অনেক দেবালয় ধ্বংস করেছেন। যারা পবিত্র উপাসনালয়ের দরোজা বন্ধ করে তাদের ধ্বংসের জন্য কবিতায় কালাপাহাড়কে আহ্বান

জানানো হয়েছে। ***ক্ষুধার ঠাকুর–*** ক্ষুধার্ত মানুষকে দেবতাজ্ঞান করা হয়েছে। যেমন 'অতিথি নারায়ণ'। ***ক্ষুধার মানিক জ্বলে–*** ক্ষুধার্ত ব্যক্তির জঠরজ্বালা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ***গজনি মামুদ–*** গজনির সুলতান মাহমুদ। তিনি সতের বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে ধ্বংসলীলা চালান। এখানে তাঁকে উপাসনালয়ের ভণ্ড দুয়ারিদের ধ্বংস করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। ***গো-ভাগাড়–*** মৃত গরু ফেলার নির্দিষ্ট স্থান। ***চেঙ্গিস–*** চেঙ্গিস খান; মঙ্গোলীয় দুর্ধর্ষ নেতা। **জ্ঞাতি–** সগোত্র; স্বজন; একই বংশে জাত ব্যক্তি। ***ঠাকুর–*** দেবতা। **তিমির রাত্রি–** অন্ধকার রাত। ***তেরিয়া–*** উদ্ধতভাবে; উগ্রভাবে। **দ্বার–** দরজা; দুয়ার। ***পান্থ–*** পথিক। ***পুরুত–*** পুরোহিত; পূজার্চনা পরিচালনার মুখ্য ব্যক্তি। **পূজারী–** পূজাকারী; উপাসক; পুরোহিত। ***ফুকারি–*** চিৎকার করে। ***বর–*** আশীর্বাদ; কারো কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত বস্তু বা বিষয়। **ভজনালয়–** উপাসনার গৃহ বা ঘর। **ভণ্ড–** কপট; ভানকারী। ***ভুখারি–*** ক্ষুধার্ত ব্যক্তি। ***মহীয়ান–*** অতি মহান। **মুসাফির–** সফরকারী; পথিক; আগন্তুক। **শিরনি–** মুসলমান বা হিন্দু কর্তৃক সত্যপীর বা অন্য পীরের উদ্দেশ্যে নিবেদনের জন্য আটা, ময়দা, চিনি, কলা, পায়েস ইত্যাদির তৈরি ভোগ বিশেষ; ফিরনি। **শীর্ণ-গাত্র–** রোগা শরীর পাতলা দেহ। ***সাম্য–*** সমতা।

সারসংক্ষেপ :

মানব-সমাজে ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের ভেদ আছে। কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্য হল: মানুষ হিসেবে সবাই সমান। ক্ষুধার্ত পথিক খাবার চেয়েছিল মন্দিরে। সাতদিনের উপবাসী এই পথিকই পরে গিয়েছিল মসজিদে। পর্যাপ্ত খাবার ছিল। কিন্তু মন্দিরের পূজারী আর মসজিদের মোল্লা খাবার দেয়নি। এটা ধর্মসম্মত নয়। স্বার্থের জন্য কেউ কেউ ধর্মের নীতি লঙ্ঘন করে। তাদের প্রতিরোধ করতে হবে। মানুষের মর্যাদা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'মানুষ' কবিতায় মুসাফির কতদিন অভুক্ত ছিল?

ক. একদিন　　খ. তিনদিন
গ. পাঁচদিন　　ঘ. সাতদিন

২. 'ভ্যালা হলো দেখি লেঠা' পঙ্‌ক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে–

ক. সংশয়　　খ. উৎসাহ
গ. বিরক্তি　　ঘ. আনন্দ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

'কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা কে দেয় থুথু ওই গায়ে,
হয়তো তোমায় স্তন দিয়েছে সীতাসম সতী মায়ে।'

৩. উদ্দীপক ও 'মানুষ' কবিতায় যেখানে সাদৃশ্য রয়েছে–

ক. মানুষকে ঘৃণা না করা　　খ. ধর্মই সবার উপরে
গ. সমাজের উন্নয়ন　　ঘ. পুরোহিতের ঈশ্বর ভক্তি

৪. উদ্দীপক ও 'মানুষ' কবিতায় সাদৃশ্য দেখা যায় যে বিষয়ে–

i. মানবিকতা
ii. সহযোগিতা
iii. সহমর্মিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. কালা পাহাড়ের প্রকৃত নাম কী?

i. রাজচন্দ্র ii. রাজকৃষ্ণ iii. রাজনারায়ণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. উপরের সব কয়টি

৬. 'ভুখা আছ মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে! নমাজ পড়িস বেটা?' –বাক্যটিতে মোল্লার কোন বক্তব্য প্রকাশ পায়?

ক. অসহায়ত্ব খ. আবেদন গ. ঘৃণা ঘ. নিষ্ঠুরতা

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

'তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।'

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কবিতা হল–

ক. প্রাণ খ. অন্ধবধূ

গ. সেইদিন এই মাঠ ঘ. মানুষ

৮. উদ্দীপক ও 'মানুষ' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে–

i. মানুষের মনুষ্যত্ববোধ ii. পুরোহিতের ঈশ্বর ভক্তি iii. পরাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াই

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

অপরের জন্য তুমি তোমার প্রাণ দাও, আমি তা বলতে চাই নে। অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর কর। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটুখানি মিষ্টি কথা বল। পথের অসহায় মানুষটির দিকে একটু সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ কর,তাহলেই হবে। দুঃখী মানুষের ছোট ছোট দুঃখ দূর করা, অসহায় মানুষের মনে আশা জাগানো, কিংবা বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মতো ছোট ছোট উপকারে ব্রতী হওয়ার মধ্যেই মনুষ্যত্বের প্রকাশ ঘটে।

ক. 'তেরিয়া' অর্থ কী?

খ. 'অভেদ ধর্মজাতি' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের কোন দিকটি 'মানুষ' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'মানুষ' কবিতায় চেতনাগত দিক থেকে অভিন্নতা রয়েছে।" –বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. 'তেরিয়া' শব্দটির অর্থ হচ্ছে উদ্ধত বা উগ্র।

খ. 'অভেদ ধর্মজাতি' বলতে এখানে কবি পৃথিবীর সকল মানুষের এক ও অভিন্ন ধর্মকে বুঝিয়েছেন।

'মানুষ' কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মানবতার জয়গান গেয়েছেন। তাঁর মতে পৃথিবীর সকল মানুষ এক ধর্মের। মানুষের মধ্যে ভেদাভেদকে তিনি অস্বীকার করেছেন। পৃথিবীতে মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই। তারা একই রক্ত-মাংসের তৈরি। মানুষের সব থেকে বড় পরিচয় সে মানুষ। আর মানুষের একটাই ধর্ম তা হচ্ছে মানব ধর্ম। বস্তুত কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'মানুষ' কবিতায় 'অভেদ ধর্মজাতি' বলতে মানুষের এই অভিন্নতাকে বুঝিয়েছেন।

গ. মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের ভাবনার দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে 'মানুষ' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

পৃথিবীতে মানুষ মানুষের জন্য। এখানে সকল মানুষের সমভাবে ভোগের ও বাঁচার অধিকার রয়েছে। এ অধিকার প্রতিষ্ঠায় সকলকে সমদায়িত্বসম্পন্ন হতে হয়। কেউ যদি এখানে দায়িত্বে অবহেলা করে তবে সমাজে নেমে আসে বিষাদের কালোরাত্রি।

উদ্দীপকে বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। কারণ পৃথিবীতে বিপন্ন মানুষটিরও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। আর এক্ষেত্রে সমাজে যারা সক্ষম তাদের উদার মানসিকতায় এগিয়ে আসার প্রয়োজন রয়েছে। উদ্দীপকে বলা হয়েছে, অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর করে দাও। অসহায় মানুষটির প্রতি করুণার দৃষ্টি দাও। তাদের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখ। বিপন্ন মানুষের মনে বেঁচে থাকার আশা জাগিয়ে তোল। 'মানুষ' কবিতায়ও অনুরূপ অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে প্রতিবাদের ভাষায় বলা হয়েছে, মন্দির-মসজিদ পুরোহিত ও মোল্লারা দখল করে বসে আছে। সেখানে নিরন্ন মানুষেরা খাবার পায় না। কবি বলেছেন, ঐ ভজনালয়ের বদ্ধ দ্বার হাতুড়ি-শাবল দিয়ে খুলে ফেলতে। আর সেখান থেকে খাবার এনে দরিদ্র অসহায় মানুষের মুখে তুলে দিতে। এভাবে দেখা যায় উদ্দীপক ও 'মানুষ' কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে নিরন্ন অসহায় মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা। সুতরাং এদিক থেকে বলা যায় উদ্দীপক ও 'মানুষ' কবিতায় সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপক ও 'মানুষ' কবিতায় মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আমাদের সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ রয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই অসহায় ও বিপন্ন। তাদের এ অসহায় অবস্থা দূর করার দায়িত্ব সমাজের সক্ষম ব্যক্তিদের। আর এ দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে।

উদ্দীপকে মানবতার প্রতি উদার আকুতি জানানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর কর। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। একটুখানি মিষ্টি কথা বল। পথের অসহায় মানুষটির দিকে করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। এভাবে বিপন্ন মানুষের উপকার ও দুঃখী মানুষের ছোট ছোট দুঃখ দূর করায় মানবাত্মা জাগ্রত হয় এবং মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। কবি কাজী নজরুল ইসলামও 'মানুষ' কবিতায় মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। কবিতাটিতে তার প্রতিপক্ষ ছিল নিষ্ঠুর ও স্বার্থবাদী মোল্লা শ্রেণি। তারা মসজিদ ও মন্দিরে দান হিসাবে পাওয়া গোশত-রুটি ও প্রসাদ-মিষ্টান্ন একাই দখল করে বসে আছে। তারা অন্নহীন ভুখা মানুষকে তাড়িয়ে দিয়েছে নিষ্ঠুরভাবে। মন্দির ও মসজিদে দুয়ার বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। কবি তার প্রতিবাদী ভাষায় এসব অনাচারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি মসজিদ-মন্দিরের দুয়ার খুলে এসব নিরন্ন মানুষকে খাবার দিতে বলেছেন। তাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটাতে বলেছেন। অবশ্য কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় প্রতিবাদের চেতনা প্রবল হয়ে উঠেছে।

উদ্দীপক ও 'মানুষ' কবিতায় মানুষের মনুষ্যবোধের জাগরণ কামনা করা হয়েছে। কেননা মানুষের সব চেয়ে বড় পরিচয় সে মানুষ। অতএব,উদ্দীপক এবং 'মানুষ' কবিতাটির মূলভাব বিশ্লেষণ করে বলা যায়, চেতনাগত দিক থেকে এ দুটোর মধ্যে অভিন্নতা রয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

আমরা সকল দেশের, সকল জাতির সকল ধর্মের, সকল কালের। আমরা মুরিদ যৌবনের। এই জাতি-ধর্মের-কালকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে যাঁহাদের যৌবন, তাঁহারাই আজ মহামানব, মহাত্মা, মহাবীর। তাহাদিগকে সকল দেশের সকল ধর্মের সকল লোক সমান শ্রদ্ধা করে।

ক. দুয়ারে কে দাঁড়িয়েছিল?

খ. 'ঐ মন্দির পূজারীর,হায় দেবতা, তোমার নয়।' –কেন?

গ. উদ্দীপকে 'মানুষ' কবিতার যে বিপরীত দিকগুলো ফুটে উঠেছে তা তুলে ধরুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'মানুষ' কবিতা মানুষের জয়গানে মুখরিত হয়েছে।" –আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘ	২. গ	৩. ক	৪. ক	৫. ঘ	৬. ঘ	৭. ঘ	৮. ক

সেইদিন এই মাঠ

জীবনানন্দ দাশ

কবি-পরিচিতি

জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সত্যানন্দ দাশ ও মাতা কুসুমকুমারী দাশ। কুসুমকুমারী দাশও একজন কবি ছিলেন এবং তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে,/ কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে'– এখনো জনপ্রিয় শিশুপাঠ্য। জীবনানন্দ দাশ ১৯১৫ সালে বরিশাল ব্রজমোহন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯১৭ সালে ব্রজমোহন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট, ১৯১৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে বিএ অনার্স ও ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি কলকাতা সিটি কলেজ ও বরিশাল ব্রজমোহন কলেজসহ বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের কিছু পূর্বে সপরিবারে বাংলাদেশ ত্যাগ করে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁকে বাংলা ভাষার 'শুদ্ধতম কবি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বাংলার প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যে কবি নিমগ্নচিত্ত। এ দেশের গাছপালা, লতাগুল্ম, ফুল-পাখি তাঁর আজন্ম প্রিয়। তিনি নিভৃতে ১৪টি উপন্যাস ও ১০৮টি ছোটগল্প রচনা করেছেন, যার একটিও জীবদ্দশায় প্রকাশ করেননি। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অক্টোবর জীবনানন্দ দাশ কলকাতার বালিগঞ্জে এক ট্রাম-দুর্ঘটনায় আহত হন এবং ২২ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : *ঝরা পালক*, *ধূসর পাণ্ডুলিপি*, *বনলতা সেন*, *মহাপৃথিবী*, *সাতটি তারার তিমির*, *রূপসী বাংলা*।

উপন্যাস : *মাল্যবান*, *সুতীর্থ*।

প্রবন্ধ : *কবিতার কথা*।

ভূমিকা

'সেইদিন এই মাঠ' কবিতাটি কবি জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা। সভ্যতার ধ্বংস ও বিনির্মাণে আপন মহিমা ও সৌন্দর্য নিয়ে মানবের সেবাদাত্রী প্রকৃতির অমরত্বের দিকটি এই কবিতায় তুলে ধরা হয়েছে। এখানে প্রকৃতির সৌন্দর্যচেতনায় নিজেকে সম্পৃক্ত করে অমরত্ব লাভে কবি অনুপ্রাণিত করেছেন। পৃথিবীর বহমানতা মানুষের সাধারণ মৃত্যু ঠেকাতে না পারলেও স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে অনন্তকাল– এ-কথাটাই কবি নান্দনিকতার সাথে কবিতাটিতে তুলে ধরেছেন।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- প্রকৃতির কিছু উপাদেয় উপাদান সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- মানব-অভিজ্ঞতার ক্ষণস্থায়ী আর চিরন্তন দিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

সেই দিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি
এই নদী নক্ষত্রের তলে
সেদিনো দেখিবে স্বপ্ন –
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে !
আমি চলে যাব বলে
চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউয়ে ?
লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে ?
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে !

চারিদিকে শান্ত বাতি – ভিজে গন্ধ – মৃদু কলরব;
খেয়ানৌকোগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে;
পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে র'বে চিরকাল; –
এশিরিয়া ধুলো আজ – বেবিলন ছাই হয়ে আছে।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

আমি চলে যাব বলে ... লক্ষ্মীটির তরে– পৃথিবীতে কেউই চিরস্থায়ী নয়। প্রত্যেক মানুষকেই এক সময় চলে যেতে হয়। কিন্তু শিশিরের জলে চালতা ফুল ভিজে যে রহস্যময় সৌন্দর্য ও আনন্দের বিস্তার করে চলে যুগ-যুগান্তে তার কোনো অবশেষ নেই। আর সেই শিশিরের জলে ভেজা চালতা ফুলের গন্ধের ঢেউ প্রবাহিত হতে থাকবে অনন্তকালব্যাপী। কবির এই বোধের মধ্যে প্রকৃতির এক শাশ্বতরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে, যেখানে লক্ষ্মীপেঁচাটির মমত্বের অনুভাবনাও ধরা দিয়েছে অসাধারণ এক তাৎপর্যে। **কলরব–** কোলাহল। ***এশিরিয়া ধুলো আজ – বেবিলন ছাই হয়ে আছে–*** মানুষের গড়া পৃথিবীর অনেক সভ্যতা বিলীন হয়ে গেছে। এশিরীয় ও বেবিলনীয় সভ্যতা এখন ধ্বংসস্তূপ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু প্রকৃতি তার আপন রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে চিরকাল প্রাণময় হয়ে থাকে। প্রকৃতির মধ্যে বিচিত্র গন্ধের আস্বাদ মৃদুমন্দ কোলাহলের আনন্দ, তার অন্তর্গত অফুরন্ত সৌন্দর্য কখনই শেষ হয় না। আলোচ্য অংশে জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতির এই চিরকালীন সৌন্দর্যকে বোধের এক বিস্ময়কর শক্তিতে উপস্থাপন করেছেন। **চর–** নদীতে পলি জমে গঠিত ভূভাগ। **নক্ষত্র–** তারা। **মৃদু–** কোমল; ক্ষীণ; অনুচ্চ। **স্তব্ধ–** নিশ্চল, নিস্পন্দ। ***সেইদিন এই মাঠ ... কবে আর ঝরে–*** জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতির কবি। প্রকৃতির রহস্যময় সৌন্দর্য তাঁর কবিতার মূলগত প্রেরণা। তিনি জানেন বিচিত্র বিবর্তনের মধ্যেও প্রকৃতি তাঁর রূপ-রস-গন্ধ কখনই হারিয়ে ফেলবে না। তিনি যখন থাকবেন না তখনও প্রকৃতি তার অফুরন্ত ঐশ্বর্য নিয়ে মানুষের স্বপ্নসাধ ও কল্পনাকে তৃপ্ত করে যাবে। আলোচ্য অংশে কবি প্রকৃতির এই মাহাত্ম্যকে গভীর তৃপ্তি ও মমত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন।

সারসংক্ষেপ :

কবি যখন থাকবেন না, তখনো পৃথিবীতে স্বপ্ন রয়ে যাবে। খোলা আকাশের নিচে নদী তখনো স্বপ্ন দেখবে। কারণ, সুন্দর স্বপ্নের সাধ শেষ হওয়ার নয়। ব্যক্তির মৃত্যু হলেও রয়ে যাবে সুন্দর দৃশ্যগুলো। চালতাফুল শিশিরের জলে ভিজবে। লক্ষ্মীপেঁচা গান গাইবে। প্রকৃতির যেসব সুন্দর মানুষের জীবনকে মধুর করে তোলে, সেগুলো চিরকালীন। মানুষের তৈরি সভ্যতা কিন্তু সময়ের প্রবাহে ধ্বংস হয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবি জীবনানন্দ দাশের মায়ের নাম কী?

ক. কুসুমকুমারী দাশ
খ. সবিতা ভট্টাচার্য
গ. নবনীতা দেবসেন
ঘ. আশালতা দাশ

২. 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার মূলভাব হচ্ছে–

ক. মানব সভ্যতার পরিণতি | খ. প্রকৃতির সৌন্দর্য চিরস্থায়ী
গ. প্রকৃতির সৌন্দর্য নশ্বর | ঘ. জীবাত্মা রহস্যময়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আবার আসিব আমি বাংলা নদী মাঠ খেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;

৩. উদ্দীপকের অনুভূতি নিচের কোন রচনায় প্রকাশিত হয়েছে?

ক. অন্ধবধূ | খ. আমার সন্তান
গ. সেইদিন এই মাঠ | ঘ. সোনার তরী

৪. উদ্দীপক ও আপনার পাঠ্য কবিতায় যে অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে–

i. স্মৃতিকাতরতা
ii. প্রকৃতিপ্রেম
iii. সমাজ সচেতনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i | খ. ii
গ. iii | ঘ. ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. লক্ষ্মীপেঁচা কার জন্য গান গাইবে?

ক. ডাহুক | খ. মাছরাঙা
গ. শ্যামপেঁচা | ঘ. লক্ষ্মী

৬. 'এই নদী নক্ষত্রের তলে' বলতে কবি যা বুঝিয়েছেন–

ক. সমগ্র পৃথিবীকে | খ. সমগ্র চন্দ্রকে
গ. সমগ্র মহাকাশকে | ঘ. সাত সাগর তের নদীকে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

পৃথিবীর নর-নারীর সুখ-দুঃখ-বিরহ যদি ঠিকভাবে তাঁর সৃষ্টিতে ঠাঁই পায়, তবেই তিনি অমর হবেন।

৭. উদ্দীপকের ভাবের সাথে মিল রয়েছে কোন বাক্যের?

i. সেইদিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি–
ii. পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল
iii. আমি চলে যাব বলে চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i | খ. ii
গ. iii | ঘ. i ও ii

৮. উদ্দীপক ও বাক্যটিতে সাদৃশ্যের কারণ যে বিষয়ে–

ক. ঐতিহ্য | খ. প্রকৃতি
গ. নিত্যতা | ঘ. ধ্বংস

সৃজনশীল প্রশ্ন :

চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে
বসে আছে ভোরের দোয়েল পাখি–

চারি দিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের হিজলের অশ্বত্থের
করে আছে চুপ
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে।

ক. কবি জীবনানন্দ দাশের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ কী রকম?
খ. 'পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল।' –উক্তিটি বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার সাদৃশ্য তুলে ধরুন।
ঘ. "উদ্দীপকের প্রকৃতিপ্রেম 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায়ও অনুরণিত হয়েছে।" –মূল্যায়ন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. কবি জীবনানন্দ দাশের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ এক অনন্য রূপসী।

খ. পৃথিবীতে প্রকৃতি চিরকালীন। এখানে সুন্দরের সাধনা, নতুনের আরাধনা চিরকাল চলতে থাকে। পৃথিবীতে কখনো সুন্দরের অভিপ্রায় ও স্বপ্নের আবাহন শূন্য হয় না। সে তার আপন রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে চিরকাল বেঁচে থাকে। আলোচ্য চরণটিতে এটিই বলা হয়েছে।

প্রকৃতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। সে কখনোই তার আপন রূপ-রস-গন্ধ হারিয়ে ফেলে না। সে সব সময়ই তার নিজ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে চিরকাল প্রাণময় থাকে। প্রকৃতির যে রহস্যময় সৌন্দর্য ও আনন্দের বিস্তার তার কোনো অবশেষ নেই। প্রকৃতির মধ্যে বিচিত্র গন্ধের আস্বাদ, মৃদুমন্দ কোলাহলের আনন্দ, কিংবা পুষ্পের সৌন্দর্য কখনোই শেষ হয় না। প্রকৃতির এইসব সৌন্দর্যই গল্প হয়ে পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

গ. প্রকৃতির যে অপরূপ রূপ লাবণ্য 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে, তাই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

প্রকৃতি চিরন্তন সৌন্দর্যের আধার। প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট সবকিছুই প্রকৃতির অংশ। গাছপালা, নদীনালা, আকাশ, বাতাস সবকিছুই প্রকৃতির অনুষঙ্গী। প্রকৃতির সৌন্দর্য কখনো শেষ হয় না, কখনো শেষ হবে না। মানুষ প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে পায় জীবনের সুন্দরকে। প্রকৃতি নিজস্ব নিয়মে মানুষের স্বপ্ন-সাধ ও কল্পনাকে তৃপ্ত করে। 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতা এবং উদ্দীপকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের কবির নিকট প্রকৃতির সৌন্দর্য ধরা পড়েছে শাশ্বত রূপ নিয়ে। এখানে কবি খুব ভোরে জাগ্রত হন। চারিদিকে নিশ্চুপ। ভোরের পাখিরা তখনো ডেকে ওঠেনি। বড় একটা পাতার নিচে বসে আছে দোয়েল পাখি। তার উপস্থিতি কবির চিত্তে সৌন্দর্যের বান ডাকে। উপরন্তু গ্রামবাংলার পল্লবের স্তূপ কবির সত্তাকে উজ্জীবিত করে। 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় কবিও প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। শিশিরের জলে চালতা ফুলের ভিজে ওঠার দৃশ্য কবিকে আনমনা করে। লক্ষ্মীপেঁচা যখন তার প্রিয়াকে উদ্দেশ্য করে গান ধরে তখন কবি একজন মুগ্ধ শ্রোতা হয়ে যান। কখনো বা চরের কাছে খুঁটিতে বাঁধা নৌকা কবিকে উদাসীন করে তোলে। এভাবে দেখা যায় প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করার বিষয়ে উদ্দীপকের সঙ্গে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. প্রকৃতির গতিময়তা এবং অবিনশ্বর সৌন্দর্য চেতনা 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতা এবং উদ্দীপকের মূল উপজীব্য।

পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে আজও তা প্রবহমান। প্রকৃতিও নিজস্ব নিয়মে গতিমান। প্রকৃতির এই স্বভাবধর্মকে কেউ উপলব্ধি করে, আবার কেউ এদিকে নজর দেয়না। পৃথিবীতে প্রকৃতি অনবরত সৃষ্টি আর ধ্বংসের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। এভাবেই তার ভারসাম্য রক্ষিত হয়। যেমন মানুষ এ পৃথিবীতে আসে আবার চলে যায়। এতে প্রকৃতির ভারসাম্যে কোনো পরিবর্তন হয় না।

উদ্দীপকের কবি সৌন্দর্যপিপাসু। তিনি ভোরে দোয়েল পাখি দেখেন। ডুমুরপাতার নিচে বসে থাকে দোয়েল। দোয়েলের মাথার উপর ডুমুর পাতাকে কবির ছাতা বলে মনে হয়। চারিদিকে তিনি পল্লবের স্তূপ দেখেন। আর দেখেন আম-জাম-বট-অশ্বত্থ গাছের সমাহার। গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে আর তাদের ছায়া পড়েছে ফণীমনসার ঝোঁপে। অন্যদিকে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার কবিও প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন অনুপম রূপে। এখানে খেয়া নৌকাগুলো চরের

খুব কাছে এসে থামে। চারিদিকে থাকে শান্ত বাতি। লক্ষ্মীপেঁচা তার প্রিয়ার জন্য গান গায় আর কবি তা আনমনে শোনেন। কখনো বা চালতা ফুল শিশিরের জলে ভিজে উঠলে এর গন্ধের ঢেউ প্রবাহিত হতে থাকে।

উদ্দীপক ও 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় আদি এবং অকৃত্রিমরূপে কেবল প্রকৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। কবিতা এবং উদ্দীপকে আমরা প্রকৃতি ভিন্ন অন্য কোনো অনুষঙ্গের উপস্থিতি লক্ষ করি না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে প্রকাশিত প্রকৃতিপ্রেম 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় অনুরণিত হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

আরও অনেক গাছ পাতা-লতা
নীল হলুদ বেগুনি অথবা সাদা
অজস্র ফুলের বন্যা অফুরন্ত
ঘুমের অলসতায় চোখ বুঁজে আসার মতো
শান্তি।

ক. জীবনানন্দ দাশ কোন জীবনচেতনার কবি হিসাবে পরিচিত?

খ. 'এশিরিয়া ধুলো আজ – বেবিলন ছাই হয়ে আছে।' কেন? বুঝিয়ে বলুন?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'সেই সব দিন এই মাঠ' কবিতার সাদৃশ্যগুলো নিজের ভাষায় তুলে ধরুন।

ঘ. "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও 'সেই সব দিন এই মাঠ' কবিতার প্রকৃতি বর্ণনায় যেন একটি নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে।" –আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. খ ৩. গ ৪. খ ৫. ঘ ৬. ক ৭. খ ৮. গ

অডিও/ভিডিও

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বর্তমানে বিটিভি/বংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।

শিক্ষার্থীবন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

পল্লিজননী

জসীমউদ্‌দীন

কবি-পরিচিতি

জসীমউদ্‌দীন ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলবি আনসার উদ্দিন মোল্লা ও মা আমিনা খাতুন। ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আইএ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিএ ও এমএ পাশ করেন। ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং পরে সরকারি তথ্য ও প্রচার বিভাগে উচ্চপদে যোগদান করেন। কলেজে পড়ার সময় তিনি রচনা করেন বিখ্যাত 'কবর' কবিতা এবং এই কবিতা তাঁর ছাত্রজীবনেই ম্যাট্রিক পরীক্ষার বাংলা পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় বাংলার মাঠ, ঘাট, নদী-নালা, বালুচর, চাষীর কুটির, ফুল-পাখি, গ্রামের সাধারণ মানুষ ও তাদের সুখ-দুঃখের চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সেজন্য তাঁকে বলা হয় 'পল্লিকবি'। তিনি গান, নাটক ও গদ্যরচনাতেও অবদান রেখেছেন। ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিলিট উপাধি প্রদান করে। এছাড়া সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৭৬ সালের ১৪ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : *রাখালী*, *নকসী কাঁথার মাঠ*, *বালুচর*, *সোজন বাদিয়ার ঘাট*, *এক পয়সার বাঁশী*;

উপন্যাস : *বোবাকাহিনী*;

গদ্যরচনা : *চলে মুসাফির*, *বাঙালির হাসির গল্প*, *জীবন কথা*, *হলদে পরির দেশে*।

ভূমিকা

পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের 'রাখালী' কাব্যগ্রন্থ থেকে 'পল্লিজননী' কবিতাটি সংকলন করা হয়েছে। কবিতাটিতে পল্লির আর্থ-সামাজিক করুণ অবস্থার পাশাপাশি মায়ের স্নেহার্দ্রতার কথা বলা হয়েছে। এখানে সন্তানের প্রতি মায়ের অকৃত্রিম ভালোবাসা, মুমূর্ষু সন্তানকে ঘিরে মাতৃহৃদয়ের আকুতি কবি তুলে ধরেছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

জসীমউদ্‌দীনের 'পল্লিজননী' কবিতা পড়ে আপনি –

- গ্রাম-বাংলার দরিদ্র মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কন করতে পারবেন;
- সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- পল্লিবালকের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সুখ-দুঃখের বিবরণ দিতে পারবেন;
- গ্রাম-বাংলার নিপুণ উপস্থাপনায় জসীমউদ্‌দীনের কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারবেন।

পাঠ–১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- গ্রামের গরিব মায়ের মুমূর্ষু সন্তানের অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন;
- সেবারত মায়ের উদ্বেগের ধরন বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

রাত থম থম স্তব্ধ নিঝুম, ঘোর–ঘোর–আন্ধার,
নিশ্বাস ফেলি তাও শোনা যায় নাই কোথা সাড়া কার।
রুগ্‌ন ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা,
করুণ চাহনি ঘুম ঘুম যেন ঢুলিছে চোখের পাতা।
শিয়রের কাছে নিবু নিবু দীপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলে,
তারি সাথে সাথে বিরহী মায়ের একেলা পরাণ দোলে।
ভন ভন ভন জমাট বেঁধেছে বুনো মশকের গান
এদো ডোবা হতে বহিছে কঠোর পচান পাতার ঘ্রাণ।
ছোট কুঁড়েঘর, বেড়ার ফাঁকেতে আসিছে শীতের বায়ু,
শিয়রে বসিয়া মনে মনে মাতা গণিছে ছেলের আয়ু।
ছেলে কয়, 'মারে, কত রাত আছে, কখন সকাল হবে,
ভালো যে লাগে না, এমনি করিয়া কেবা শুয়ে থাকে কবে।'
মা কয়, 'বাছারে ! চুপটি করিয়া ঘুমোত একটি বার',
ছেলে রেগে কয়, 'ঘুম যে আসে না কি করিব আমি তার।'
পাণ্ডুর গালে চুমো খায় মাতা। সারা গায়ে দেয় হাত,
পারে যদি বুকে যত স্নেহ আছে ঢেলে দেয় তারি সাথ।
নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে, দরগায় মানে দান,
ছেলেরে তাহার ভালো করে দাও কাঁদে জননীর প্রাণ।
ভালো করে দাও আল্লা রসুল ভালো করে দাও পীর,
কহিতে কহিতে মুখখানি ভাসে বহিয়া নয়ন নীর !
বাঁশ বনে বসি ডাকে কানা কুয়ো, রাতের আঁধার ঠেলি,
বাদুড় পাখার বাতাসেতে পড়ে সুপারির বন হেলি।
চলে বুনো পথে জোনাকি মেয়েরা কুয়াশা কাফন ধরি,
দুঃ ছাই! কিবা শঙ্কায় মার পরাণ উঠিছে ভরি।
যে কথা ভাবিতে পরাণ শিহরে তাই ভাসে হিয়া কোণে,
বালাই বালাই, ভালো হবে যাদু মনে মনে জাল বোনে।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

আন্ধার– অন্ধকার। **কানাকুয়ো–** এক প্রকারের পাখি। **গণিছে–** গননা করছে। **নিঝুম–** সম্পূর্ণ নীরব। **পরান–** প্রাণ। **মশক–** মশা। **রুগ্‌ণ–** পীড়িত; অসুস্থ। **শঙ্কায়–** আশঙ্কায়; ভীতিতে। **শিয়রে–** শয়নকারীর মাথার দিকে। **সাড়া–** শব্দ। **হিয়া–** হৃদয়; মন।

সারসংক্ষেপ :

থমথমে নিঝুম আঁধার রাত। গাঁয়ের এক ছোট্ট কুঁড়েঘরে মা রুগ্‌ণ সন্তানের সেবায় রাত জাগছেন। ছেলেটি ঘুমাতে পারছে না। ক্লান্তির রাত আর কাটছে চাইছে না। মাও জেগে আছেন গভীর উদ্বেগ নিয়ে। পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ছেলের গায়ে। ছেলের রোগমুক্তির জন্য দরগায়-মসজিদে দানের নিয়ত করছেন। বাইরে শীতরাতের প্রতিকূল প্রকৃতি। কুয়াশাঢাকা জোনাকি, বাদুড়ের আওয়াজ, রাতজাগা পাখির ডাক। অজানা আশঙ্কায় মায়ের মন শিহরিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'পল্লিজননী' কবিতায় কয়টি পাখির নাম পাওয়া যায়?
ক. তিনটি খ. দুইটি গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

২. 'পল্লিজননী' কবিতায় মায়ের কোন ব্যর্থতা প্রকাশ পেয়েছে?
ক. স্নেহের খ. সেবার গ. অর্থের ঘ. শাসনের

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

'এই যে মায়ের কোল, ভয় কীরে বাপ
বক্ষে তারে চাপি ধরি তার জ্বরতাপ।'

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ 'পল্লিজননী'র চরণটি হল–
i. বাদুড় পাখার বাতাসেতে পড়ে সুপারির বন হেলি।
ii. করুণ চাহনি ঘুম ঘুম যেন ঢুলিছে চোখের পাতা।
iii. পাণ্ডুর গালে চুমো খায় মাতা। সারা গায়ে হাত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৪. উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতায় ফুটে ওঠা দিকটি হল–
i. স্বজন হারানোর আশঙ্কা ii. প্রিয়জনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা iii. অপত্য স্নেহের অনিবার্য প্রকাশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও ii

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- গরিব পল্লিবালকের স্বপ্ন ও আনন্দের বর্ণনা লিখতে পারবেন;
- দরিদ্র পল্লিজননীর মাতৃস্নেহের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

ছেলে কয়, 'মাগো, পায়ে পড়ি বল ভালো যদি হই কাল,
করিমের সাথে খেলিবারে গেলে দিবে নাত তুমি গাল।
আচ্ছা মা বলো, এমন হয় না রহিম চাচার ঝাড়া,
এখনি আমারে এত রোগ হতে করিতে পারেত খাড়া ?'
মা কেবল বসি রুগ্‌ন ছেলের মুখ পানে আঁখি মেলে,
ভাসা ভাসা তার যত কথা যেন সারা প্রাণ দিয়ে গেলে।
'শোন মা, আমার লাটাই কিন্তু রাখিও যতন করে,
রাখিও ট্যাঁপের মোয়া বেঁধে তুমি সাত-নরি সিকা ভরে।

খেজুরে গুড়ের নয়া পাটালিতে হুড়ুমের কোলা ভরে।
ফুলঝুরি সিকা সাজাইয়া রেখো আমার সমুখ পরে।'
ছেলে চুপ করে, মাও ধীরে ধীরে মাথায় বুলায় হাত,
বাহিরেতে নাচে জোনাকি আলোয় থম থম কাল রাত।
রুগ্‌ণ ছেলের শিয়রে বসিয়া কত কথা পড়ে মনে,
কোন দিন সে যে মায়েরে না বলে গিয়াছিল দূর বনে।
সাঁঝ হয়ে গেল তবু আসে নাকো, আই চাই মার প্রাণ,
হঠাৎ শুনিল আসিতেছে ছেলে হর্ষে করিয়া গান।
এক কোঁচ ভরা বেথুল তাহার ঝামুর ঝুমুর বাজে,
ওরে মুখপোড়া কোথা গিয়াছিলি এমনি এ কালি সাঁঝে।
কত কথা আজ মনে পড়ে তার, গরীবের ঘর তার,
ছোটখাট কত বায়না ছেলের পারে নাই মিটাবার।
আড়ঙের দিনে পুতুল কিনিতে পয়সা জোটেনি তাই,
বলেছে আমরা, মোসলমানের আড়ঙ দেখিতে নাই।
করিম যে গেল ? আজিজ চলিল ? এমনি প্রশ্ন মালা,
উত্তর দিতে দুখিনী মায়ের দ্বিগুণ বাড়িত জ্বালা।
আজও রোগে তার পথ্য জোটেনি, ওষুধ হয়নি আনা,
ঝড়ে কাঁপে যেন নীড়ের পাখিটি জড়ায়ে মায়ের ডানা।
ঘরের চালেতে হুতুম ডাকিছে, অকল্যাণ এ সুর,
মরণের দূত এলো বুঝি হায় হাঁকে মায়, দূর–দূর।
পচা ডোবা হতে বিরহিণী ডাক ডাকিতেছে ঝুরি' ঝুরি',
কৃষাণ ছেলেরা কালকে তাহার বাচ্চা করেছে চুরি।
ফেরে ভন্ ভন্ মশা দলে দলে, বুড়ো পাতা ঝরে বনে,
ফোঁটায় ফোঁটায় পাতা-চোঁয়া জল ঝরিছে তাহার সনে।
রুগ্‌ণ ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা,
সম্মুখে তার ঘোর কুজ্ঝটি মহাকাল রাত পাতা।
পার্শ্বে জ্বলিয়া মাটির প্রদীপ বাতাসে জমায় খেল;
আঁধারের সাথে যুঝিয়া তাহার ফুরায়ে এসেছে তেল।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

আড়ঙের দিনে– আড়ঙ হলো হাট বা বাজার বা মেলা। আড়ঙের দিনে মানে হলো মেলার দিনে বা হাটের দিনে বা বাজারের দিনে। **চোঁয়া–** বিন্দু বা ফোঁটা ফোঁটা করে পড়া। **দূত–** সংবাদ বহনকারী; বার্তাবহ। ***নয়নের নীর–*** চোখের পানি। ***নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে–*** নামাজের ঘর হলো মসজিদ, মোমবাতি মানে অর্থ হলো মোমবাতি দেওয়ার মানত করা। কোনো অসুখ-বিসুখ বা বিপদ-আপদ হলে এ দেশের মানুষ তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার অভিপ্রায়ে এক ধরনের মানত করে। 'নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে' অর্থ হলো মসজিদে মোমবাতি দেওয়ার প্রতিজ্ঞা বা মানত করা। ***পচান–*** পচে গেছে এমন। **পথ্য–** রোগির জন্য উপযুক্ত আহার্য। **বায়না–** আবদার। **বিরহিণী–** বিরহে কাতর নারী। **মহাকাল–** ভাবীকাল; অনন্তকাল। **যতন–** যত্ন। ***রহিম চাচার ঝাড়া–*** আমাদের দেশে রোগ-বালাই থেকে মুক্তি লাভের জন্য পানি পড়া, ঝাড়-ফোকের প্রচলন আছে। নানা ধরনের অসুখে অনেকে পানি পড়ে তা রোগিকে খেতে দেয়, রোগ থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশে। 'রহিম চাচার ঝাড়া' মানে হলো রহিম চাচার সেই রকম একটি চিকিৎসা পদ্ধতি, যাতে 'রহিম চাচা' রোগি ছেলেটিকে ফুঁ দিয়ে সুস্থ করে তুলবে। **লাটাই–** নাটাই; যাতে ঘুড়ির সুতা জড়ানো থাকে। **সমুখ–** সামনে। **হর্ষে–** আনন্দে।

সারসংক্ষেপ :

ভালো হয়ে পরদিনই খেলতে যাবে – মায়ের কাছে এ আবদার জানায় ছেলেটি। তার রোগে ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা হয়নি। সে আশা করে, রহিম চাচার ঝাড়-ফুঁকে সে সুস্থ হয়ে উঠবে। গ্রামের দুরন্ত কিশোর সে। হৈ-হুল্লোড়ে কাটত তার সারাদিন। অসুস্থ ছেলের সেই চঞ্চলতার সুযোগ নেই। পুত্রের শিয়রে বসে বিমর্ষ মা সেসব কথাই স্মরণ করেন। দারিদ্র্যের কারণে ছেলের অনেক চাওয়া তিনি পূরণ করতে পারেননি। আর এখন তো বিনা চিকিৎসায় সে মরতে বসেছে। রাতের প্রকৃতি মায়ের মনের শঙ্কা বাড়িয়ে দেয় শতগুণ। পাশে রাখা মাটির প্রদীপের তেল ফুরিয়ে এসেছে। নিরুপায় মাও যেন ছেলের মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

৫. অকল্যাণের সুরে কে ডাকে?
ক. হুতোম খ. শালিক গ. জোনাকি ঘ. কাক

৬. 'ওরে মুখপোড়া কোথা গিয়েছিলি এমনি এ কালি সাঁঝে?' এখানে 'মুখপোড়া' বলতে বোঝানো হয়েছে–
ক. মিত্রকে খ. হনুমানকে
গ. শত্রুকে ঘ. ছেলেকে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

কিশোর বুধা খেলার ছলে কাকতাড়ুয়া সাজে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেলেও তার বাড়ি ফেরার কোনো নাম থাকে না। এদিকে মা অধীর হয়ে পথ চেয়ে থাকেন। একসময় দেখা যায় বুধা তার বন্ধুর সঙ্গে গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরছে।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে মিল রয়েছে নিম্নের যে চরণটির–
i. বালাই বালাই, ভালো হবে যাদু মনে মনে জাল বোনে।
ii. রাখিও ট্যাঁপের মোয়া বেঁধে তুমি সাত-নরি সিকা ভরে।
iii. হঠাৎ শুনিল আসিতেছে ছেলে হর্ষে করিয়া গান।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৮. উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতায় যে বিষয়টি অভিব্যক্ত হয়েছে–
ক. ছেলের বখাটেপনা খ. ছেলের দুরন্তপনা গ. ছেলের অবাধ্য হওয়া ঘ. ছেলের চালাকি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. 'কানাকুয়ো' কোথায় থাকে?
ক. বটগাছে খ. বাঁশবনে গ. সুন্দরবনে ঘ. তালগাছে

১০. 'সাত-নরি' বলতে যা বোঝানো হয়েছে–
ক. মাটির ঘড়া খ. ঘড়া রাখার সিকা গ. মাটির হাঁড়ি ঘ. হাঁড়ি রাখার সিকা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

'তুই আমার ছেলে,তুই আমার মেয়ে,তুই আমার সব।' বলিতে বলিতে সে ছেলেকে একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিল।

১১. উদ্দীপকে 'পল্লিজননী' কবিতার যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে–
ক. অনুযোগ খ. অসহায়ত্ব গ. মাতৃস্নেহ ঘ. আকুতি

১২. উদ্দীপকে ফুটে ওঠা দিকটি নিচের যে চরণে বিদ্যমান–
i. পাণ্ডুর গালে চুমো খায় মাতা। সারা গায়ে দেয় হাত

ii. ভালো করে দাও আলা রাসুল ভালো করে দাও পীর

iii. শিয়রে বসিয়া মনে মনে মাতা গণিছে ছেলের আয়ু

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

শমসের চৌধুরী দেশের একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি। কিন্তু তার মন ভালো নেই। তার একমাত্র ছেলে আবির দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। দেশের নামকরা ডাক্তার দিয়ে তিনি ছেলের চিকিৎসা করিয়েছেন। দেশ-বিদেশের অনেক ঘাটের পথ্য সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। ছেলের জন্য তিনি নামাজের ঘরে মোমবাতি মানত করেছেন, দরগায় করেছেন দান। মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট তিনি ছেলের জন্য প্রার্থনা করেছেন। রসুলকে স্মরণ ও পিরের নিকট দোয়া কামনা করেছেন।

ক. জসীম উদ্‌দীন বাংলা সাহিত্যে কোন ধারার কবি হিসেবে খ্যাত?

খ. মা রাত্রি জাগে কেন?

গ. উদ্দীপকটি 'পল্লিজননী' কবিতার সঙ্গে কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতায় মিলের চেয়ে অমিলটিই বেশি প্রকাশিত হয়েছে।" –উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে জোড়হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধেভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥

ক. 'হুড়োম' কী?

খ. 'রহিম চাচার ঝাড়া' বলতে কী বোঝায়?

গ. কোন দিক থেকে উদ্দীপকটি 'পল্লিজননী' কবিতার সঙ্গে সদৃশ কিংবা বিসদৃশ? –আলোচনা করুন।

ঘ. "অকৃত্রিম মমত্ববোধই উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতার বিষয়বস্তু।" –বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক. জসীম উদ্‌দীন বাংলা সাহিত্যে 'পল্লিকবি' হিসাবে খ্যাত।

খ. সন্তানের অসুস্থতার কারণে মা তার শিয়রে বসে আছেন।

'পল্লিজননী' কবিতায় ছেলেটি দীর্ঘদিন ধরে রুগ্‌ণ। সন্তানের অসুস্থতায় মায়ের মন স্বাভাবিকভাবে ভালো থাকে না। তিনি মনোকষ্টে ভোগেন। ছেলের ঘুম আসছে না বলে তিনি ছেলেকে ঘুম পড়ানোর চেষ্টা করেন। ছেলের প্রতি মমত্ববোধের কারণে মা রাত জেগে রুগ্‌ণ ছেলের শিয়রে বসে আছেন।

গ. উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতা উভয়টিতেই সন্তান হারানোর আশঙ্কা ফুটে উঠেছে। এদিক থেকে উদ্দীপকটির সঙ্গে 'পল্লিজননী' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

পিতা-মাতাই জগতে সন্তানের জন্য সবচেয়ে বেশি মমত্ববোধ পোষণ করেন। তারা কখনোই সন্তানের জন্য অমঙ্গল কামনা করেন না। সন্তানের রোগ-শোক-দুঃখ-বেদনায় তারা সব সময় অস্থির থাকেন। সন্তানের জন্য অজানা আশঙ্কায় তাদের মন কেঁপে উঠে। সন্তানের জন্য পিতা-মাতা এক চির কল্যাণের আশ্রয়।

'পল্লিজননী' কবিতায় কবি এক দরিদ্র জননীর জীবনের দৃশ্যপট তুলে ধরেছেন। এই মা দরিদ্র। কিন্তু ছেলের জন্য তার অফুরান ভালোবাসা। তিনি তার রুগ্‌ণ ছেলের শিয়রে বসে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিচ্ছেন। পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ছেলের গালে, মুখে। ছেলের জন্য দরগায় মানত করছেন। আবার অজানা আশঙ্কায় ছেলের জন্য মন গুমরে কেঁদে উঠছে। উদ্দীপকেও আমরা এরকম এক সন্তানবৎসল পিতার পরিচয় পাই। তিনি শমসের চৌধুরী। সন্তানের চিকিৎসার জন্য তিনি দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে ওষুধপত্র সংগ্রহ করেছেন। সন্তানের

সুস্থতা কামনায় তাকে নামাজের ঘরে মোমবাতি এমনকি দরগায় পর্যন্ত দান করতে দেখা যায়। উপরন্তু তিনি নিয়ত আল্লাহর রসুলকে স্মরণ এবং পিরের নিকট দোয়া কামনা করেছেন। এভাবে দেখা যায় 'পল্লিজননী' কবিতার মায়ের আর্তি উদ্দীপকের শমসের চৌধুরীর বেদনারূপে প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'পল্লিজননী' কবিতার মিলের চেয়ে অমিলই বেশি দেখা যায়।

সন্তানের নিকট মায়ের স্নেহ অতুল সম্পদ। সন্তানের জন্য পিতা-মাতার মন সব সময় ব্যাকুল থাকে। বিশেষ করে সন্তান অসুস্থ থাকলে মায়ের মন স্বাভাবিক থাকে না। সন্তানের সুখ-দুঃখের সঙ্গে যেন মায়ের সুখ-দুঃখ মিশে থাকে। কেননা সন্তানের অনুভবের সঙ্গে মায়ের অনুভবের একটি নিবিড় যোগসূত্র থাকে। তাই সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় মা সবসময় চিন্তিত থাকেন।

উদ্দীপকে শমসের চৌধুরীর ছেলে হারানোর আশঙ্কা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকে পল্লি মায়ের মতো জীবনের সামগ্রিক পরিচয় নেই। শমসের চৌধুরী একজন শিল্পপতি। দারিদ্র্যের কশাঘাত তার জীবনে নেই। ছেলের জন্য দেশ-বিদেশের চিকিৎসক তিনি অবলীলায় ডাকতে পেরেছেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে ছেলের জন্য ওষুধ-পত্র সংগ্রহ করেছেন। তিনি কখনো ছেলের শিয়রে বসে রাত জাগেননি। দারিদ্র্য কী জিনিস সে সম্পর্কে তার ছেলের কোনো ধারণা নেই। অবশ্য ছেলের জন্য তিনি দরগায় মানত করেছেন, রসুলের স্মরণ নিয়েছেন। পিরের দোয়াও প্রার্থনা করেছেন। অপরদিকে 'পল্লিজননী' কবিতায় দারিদ্র্যক্লিষ্ট এক পল্লি মায়ের জীবনের বর্ণনা রয়েছে। তিনি রাত জেগে রোগাক্রান্ত সন্তানের শিয়রে বসে থাকেন। তার কুঁড়েঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে শীতের বাতাস অবাধে প্রবেশ করে। রোগে তার ছেলের পথ্য জোটে না। শীতের দুরন্ত রাতে কানাকুয়ো পাখির ডাকে মায়ের শঙ্কা বেড়ে যায়।

উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতায় মিল রয়েছে মা ও শমসের চৌধুরীর ছেলে হারানোর আশঙ্কায়। সন্তানের প্রতি প্রবল মমত্ববোধের ক্ষেত্রে। কিন্তু জীবন পরিচর্যায় দুজনের বিস্তর ব্যবধান। এ ব্যবধান আর্থ-সামাজিক সকল বিষয়েই রয়েছে। তাই বলা যায়, 'উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতায় মিলের চেয়ে অমিলই বেশি প্রকাশিত হয়েছে।' –মন্তব্যটি যথার্থ ও প্রাসঙ্গিক হয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ এর নমুনা উত্তর :

ক. 'হুড়োম' শব্দের অর্থ মুড়ি অথবা মুড়ির মত ভাজা চিড়া।

খ. 'রহিম চাচার ঝাড়া' একটি গ্রামীণ চিকিৎসা পদ্ধতি।

আমাদের দেশে গ্রামীণ সমাজে রোগ-বালাই থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে পানি পড়া এবং ঝাড়-ফুঁকের প্রচলন রয়েছে। এই পদ্ধতিতে যারা চিকিৎসা করেন তারা নানা ধরনের অসুখে রোগ থেকে মুক্তি লাভের জন্য পানি পড়ে রোগিকে খেতে দেয়। কখনো কখনো রোগিকে ফুঁ-ও দিয়ে থাকে। 'রহিম চাচার ঝাড়া' বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে রহিম চাচার সেই রকম একটি চিকিৎসা পদ্ধতি যার সাহায্যে তিনি রোগি ছেলেটিকে ফুঁ দিয়ে সুস্থ করে তুলবেন।

গ. 'পল্লিজননী' কবিতায় বর্ণিত প্লটটি পার্থিব জীবনের, বাস্তব জীবনের রক্ত-মাংসের মানুষ এর কুশীলব। উদ্দীপকের চরিত্রের একটি অংশ অপার্থিব, এর প্রধান চরিত্রটি ঐশ্বরিক। এখানেই উদ্দীপকের সঙ্গে 'পল্লিজননী' কবিতার বিসদৃশ ভাব হয়েছে।

সন্তানের প্রতি অপত্যস্নেহে বাঙালি জননী তুলনারহিত। মা নিজ জীবনের চেয়ে তার সন্তানকে বেশি ভালোবাসেন। সন্তানের সুন্দর জীবনই তার জীবনে পরম আকাঙ্ক্ষিত। সন্তানের বিপদ-আপদে তার মন অস্থির হয়ে উঠে। মা সন্তানের মাথার উপর পরম মমতাময় ছায়া। যুগ যুগ ধরে আমাদের সংস্কৃতিতে মায়ের এই স্নেহময় রূপটিই প্রাধান্য লাভ করেছে।

'পল্লিজননী' কবিতায় এক স্নেহময়ী মায়ের জীবন চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি রাত জেগে পুত্রের শিয়রে বসে থাকেন। ছোট কুঁড়েঘরে শীতের শীতল বায়ু থেকে পুত্রকে আগলে রাখেন। পুত্রের সুস্থতা কামনায় নামাজের ঘরে মোমবাতি মানেন, দরগায় দান-খয়রাত করেন। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। উদ্দীপকেও আমরা দেখি পাটুনীর সন্তানের জন্য অপত্য স্নেহের প্রকাশ ঘটেছে। উদ্দীপকে দেবী পাটুনীকে বর দিতে চাইলেও সে নিজের জন্য কিছু চায় না। তার জীবনের চাওয়া হলো সন্তানের একটি প্রশান্তিময় সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ। উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতাটি

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় 'পল্লিজননী' কবিতার মায়ের চাওয়া বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক আর উদ্দীপকে রয়েছে অলৌকিকের ব্যঞ্জনা। তাই বলা যায়, উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতার প্রেক্ষণ বিন্দুতে বিসদৃশ ভাব রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতায় অপার মমত্ববোধই প্রকাশিত হয়েছে।

সন্তানের মঙ্গল কামনা বাঙালি জননীর চির চাওয়া। তার জীবন আবর্তিত হয় সন্তানকে ঘিরে। সন্তানের সুখের জন্য মা তার নিজের সুখকে বিসর্জন দেন। জীবনের সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে মা তার সন্তানকে আগলে রাখেন। বস্তুত মা সন্তানের সুখ-দুঃখ,আনন্দ-বেদনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেন। বাঙালি নারীর এ চিরকালীন রূপটিই চির প্রবহমান।

'পল্লিজননী' কবিতায় আমরা সন্তানের জন্য প্রবল মাতৃত্ববোধ ফুটে উঠতে দেখি। একজন মা অসুস্থ ছেলের শিয়রে বসে তার সেবা করছে। তিনি বসে বসে তার শৈশবের কথা স্মরণ করছেন। ছেলের তুচ্ছ আবদারগুলো পূরণ করতে না পারার ব্যর্থতা তাকে কাতর তুলেছে। সন্তানের মঙ্গল কামনায় তার চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা বইছে। তিনি ছেলের সুস্থতা কামনায় নামাজের ঘরে মোমবাতি মানত করেছেন, আর দরগায় করেছেন দান। এত কিছুর পরও সন্তানের অকল্যাণ আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়েছেন। উদ্দীপকেও দেখি সন্তানের মঙ্গল কামনায় একটি স্বর্গীয় বাতাবরণ। দেবী পাটুনীকে বর চাইতে বললে সে নিজের জন্য কিছুই চায় না। সে চেয়েছে তার সন্তানের জন্য প্রশান্তিময় জীবন ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ। উদ্দীপকের পাটুনী চরিত্রটি সন্তান স্নেহের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে।

আমাদের সমাজ জীবনে মা হিসেবে একজন নারীর অকৃত্রিম স্নেহ ও পরম মমত্ববোধ প্রকাশিত হয় তার সন্তানকে আবর্তন করে। বলা যায়, 'পল্লিজননী' কবিতা ও উদ্দীপক উভয়টিতে বিষয়টি অনুরণিত হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

অনিন্দ্য জীবনে আজ প্রথম ভাত রাঁধতে গেল। সে না পারল মাড় গালতে, না পারল ভালো করে ভাত বাড়তে। মা একবার নিজে উঠবার চেষ্টা করলেন কিন্তু মাথা সোজা করতে পারলেন না, বিছানায় গড়িয়ে পড়ে গেলেন। অবশেষে মাতা-পুত্রের একরকম ভাত খাওয়া হল। মা পুত্রকে রান্নার নিয়ম শেখাতে গিয়ে থেমে গেলেন। পুত্রের দিকে তাকিয়ে তার চোখ দিয়ে কেবল অঝোর ধারায় অশ্রু বইতে লাগল।

ক. 'পল্লিজননী' কবিতায় ঘরের চালে কোন পাখি ডাকে?

খ. 'আজও রোগে তার পথ্য জোটেনি' –উক্তিটি বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকটি 'পল্লিজননী' কবিতার কোন দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক এবং'পল্লিজননী' কবিতা উভয়ক্ষেত্রেই অপত্য মাতৃস্নেহ প্রকাশিত হয়েছে।" –বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. গ ৩. গ ৪. গ ৫. ক ৬. ঘ ৭. গ ৮. খ ৯. খ ১০. ঘ ১১. গ ১২. ক

অডিও/ভিডিও

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বর্তমানে বিটিভি/বংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।

শিক্ষার্থীবন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

বৃষ্টি

ফররুখ আহমদ

কবি-পরিচিতি

ফররুখ আহমদ ১৯১৮ সালের ১০ জুন মাগুরা জেলার মাঝআইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ হাতেম আলী ও মা রওশন আখতার। ১৯৩৭ সালে তিনি খুলনা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন ও ১৯৩৯ সালে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। তিনি কিছুকাল স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনে এবং সেন্টপল কলেজে ইংরেজিতে অনার্স পড়েন। কিন্তু পরীক্ষা না দিয়েই কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। কর্মজীবনে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত ঢাকা বেতার কেন্দ্রের স্টাফ রাইটার ছিলেন। এর আগে তিনি বিভিন্ন চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন। সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে মুসলিম পুনর্জাগরণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর কবিতায় বাংলার অধঃপতিত মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের অনুপ্রেরণা প্রকাশ পেয়েছে। এজন্য তাঁকে 'মুসলিম রেনেসাঁর কবি' বলা হয়। ইসলামের আদর্শ তাঁর কাব্যসৃষ্টির মূল প্রেরণা। কাব্যচর্চার বৈচিত্র্য ও কবি-ভাবনার মৌলিকত্বে কবি ফররুখ আহমদ সমধিক খ্যাত। তিনি তাঁর কাব্যে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সংগে আরবি, ফারসি ও উর্দু শব্দের প্রয়োগ করেছেন। সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৭৪ সালের ১৯ অক্টোবর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

সাত সাগরের মাঝি, *সিরাজাম্ মুনীরা*, *নৌফেল ও হাতেম*, *মুহূর্তের কবিতা*, *পাখির বাসা*, *হাতেমতায়ী*, *নতুন লেখা*, *হরফের ছড়া*, *ছড়ার আসর*।

ভূমিকা

ফররুখ আহমদ তাঁর বিখ্যাত 'বৃষ্টি' কবিতায় বৃষ্টি সম্পর্কে মনের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। বৃষ্টিহীন প্রকৃতির রুক্ষতা এবং মানবমনে তার প্রভাব সম্পর্কে কবি এই কবিতায় ধারণা দিয়েছেন। প্রকৃতির স্নিগ্ধ কোমল রূপ ফিরিয়ে এনে বর্ষ কীভাবে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তোলে তার ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। মানুষের অতীত ও বর্তমানের নানা টানাপড়নে বর্ষামুখর দিনের গুরুত্ব কবি তুলে ধরেছেন।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- গ্রীষ্মের রুক্ষতা আর বর্ষার প্রাণময় সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- মানুষের মনে মেঘ-বৃষ্টির প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বৃষ্টি এলো ... বহু প্রতীক্ষিত বৃষ্টি ! – পদ্মা মেঘনার
দুপাশে আবাদি গ্রামে, বৃষ্টি এলো পুবের হাওয়ায়,
বিদগ্ধ আকাশ, মাঠ ঢেকে গেল কাজল ছায়ায়;
বিদ্যুৎ-রূপসী পরি মেঘে মেঘে হয়েছে সওয়ার।
দিকদিগন্তের পথে অপরূপ আভা দেখে তার
বর্ষণমুখর দিনে অরণ্যের কেয়া শিহরায়,
রৌদ্র-দগ্ধ ধানক্ষেত আজ তার স্পর্শ পেতে চায়,
নদীর ফাটলে বন্যা আনে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার।

রুগ্‌ণ বৃদ্ধ ভিখারীর রগ-ওঠা হাতের মতন
রুক্ষ মাঠ অসমান শোনে সেই বর্ষণের সুর,
তৃষিত বনের সাথে জেগে ওঠে তৃষাতপ্ত মন,
পাড়ি দিয়ে যেতে চায় বহু পথ, প্রান্তর বন্ধুর,
যেখানে বিস্মৃত দিন পড়ে আছে নিঃসঙ্গ নির্জন
সেখানে বর্ষার মেঘ জাগে আজ বিষণ্ন মেদুর ॥

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

আবাদি– চাষযোগ্য। **কেয়া–** কেতকী ফুল বা তারগাছ। **তৃষিত–** পিপাসাযুক্ত। **প্রান্তর–** মাঠ; জনবসতি প্রভৃতি নেই এমন বিস্তৃত ভূমি। ***তৃষ্ণাতপ্ত–*** পিপাসায় কাতর। **প্রতীক্ষিত–** প্রতীক্ষা করা হয়েছে বা হচ্ছে এমন। **বন্ধুর–** অসমতল; উঁচু-নিচু। ***বিদ্যুৎ রূপসী পরি–*** বিদ্যুৎ চমকানোকে লোকজ ধারণা অনুযায়ী সুন্দরী পরির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যে মেঘে মেঘে ঘুরে বেড়ায়। ***বিষণ্ন মেদুর–*** বৃষ্টিবিহীন প্রকৃতির রুক্ষতা বৃষ্টির আগমনে দূরীভূত হয়েছে। প্রকৃতি এখন স্নিগ্ধকোমল হয়ে চারিদিক করে তুলেছে প্রাণোচ্ছল। **বিদগ্ধ–** পক্ক; রসজ্ঞানসম্পন্ন; নিপুণ। ***রুগ্‌ণ বৃদ্ধ ভিখারীর ... তৃষ্ণাতপ্ত মন–*** দীর্ঘ বর্ষণহীন দিনে মাঠঘাট শুকিয়ে যে রুক্ষ মূর্তি ধারণ করেছে কবি তাকে রুগ্‌ণ বৃদ্ধ ভিখারীর রগ-ওঠা হাতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এখন বর্ষণের শুরুতে তৃষ্ণাকাতর মাঠ-ঘাট ও বনে দেখা দিয়েছে প্রাণের জোয়ার। **শিহরা–** শিউরে ওঠা; কম্পিত হওয়া। ***সওয়ার–*** আরোহী।

সারসংক্ষেপ :

গ্রীষ্মকালে মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির হয়ে যায়। হয়ে ওঠে বৃদ্ধ ভিখারির রগ-ওঠা হাতের মতো। এরপর আসে বহু-প্রতীক্ষিত বৃষ্টি। আকাশে কালো মেঘ জমে। বিদ্যুৎ চমকায়। বৃষ্টির পানির পরশে তৃষ্ণার্ত গাছগুলো প্রাণপ্রাচুর্যে ভরে ওঠে। প্রকৃতিতে দেখা দেয় প্রাণের জোয়ার। মানুষের মনও মেঘ-বৃষ্টির প্রভাব এড়াতে পারে না। নিবিড় বর্ষার দিনে মানুষ স্মৃতিকাতর হয়। মন ছুটে যায় স্মৃতির নির্জনে; বর্ষার মেঘের মতো দূরদেশে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'বৃষ্টি' কবিতায় কোন কোন নদীর উল্লেখ আছে?
ক.পদ্মা-মেঘনা খ. মেঘনা-যমুনা গ. ব্রহ্মপুত্র-বানার ঘ. পদ্মা-যমুনা

২.'বিষণ্ন মেদুর' শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে–
ক. হতাশা খ. স্নিগ্ধ কোমল গ. তৃষ্ণার্ত মন ঘ. অবসাদ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

৩. 'তৃষিত বনের সাথে জেগে ওঠে তৃষাতপ্ত মন' –এ বক্তব্যের সদৃশ ভাব রয়েছে কোন বাক্যটিতে?

i. নিশি রাইত বাঁশ বাগান বিস্তর জোনাকি সাক্ষী। ii. যেখানে বিস্মৃত দিন পড়ে আছে নিঃসঙ্গ নির্জন।

iii. দু-পাশে আবাদি গ্রামে, বৃষ্টি এলো পুবের হাওয়ায়।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৪. উদ্দীপক ও 'বৃষ্টি' কবিতার আলোকে বলা যায় বর্ষার আগমনে মানুষের মন–

ক. বিষণ্ন হয় খ. বিরহ কাতর হয় গ. স্মৃতিকাতর হয় ঘ. বিরক্ত হয়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'কেয়া' কোথায় থাকে?

ক. অরণ্যে খ. বিলে গ. মাঠে ঘ. খালে

৬. 'বৃষ্টি' কবিতায় বৃষ্টিকে বলা হয়েছে–

i. কাজল ছায় ii. রূপসী পরি iii. বহু প্রতীক্ষিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. iii ঘ. i ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

'বাদলের সাথে মিশিয়া গড়িছে আরেক কল্পলতা।'

৭. উদ্দীপকের বক্তব্যের বিপরীত ভাব রয়েছে যে বাক্যে–

i. রৌদ্র-দগ্ধ ধানক্ষেত আজ তার স্পর্শ পেতে চায়

ii. নদীর ফাটলে বন্যা আনে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার

iii. রুক্ষ মাঠ আসমান শোনে সেই বর্ষণের সুর।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii

৮. এরূপ বৈপরীত্যের কারণ হচ্ছে–

ক. বৃষ্টির প্রত্যাশা খ. জলের প্রত্যাশা গ. বন্যার আগমন ঘ. সিডরের তাণ্ডব

সৃজনশীল প্রশ্ন :

ব্যাকুল বেগে আজি বহে যায়,
বিজলী থেকে থেকে চমকায়
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়।

ক. 'সওয়ার' অর্থ কী?

খ. 'বিদগ্ধ আকাশ' বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে 'বৃষ্টি' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'বৃষ্টি' কবিতার একটি বিশেষ ভাবকে ধারণ করেছে, সমগ্রতাকে নয়।" –আপনার মতামত কী?

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. 'সওয়ার' শব্দের অর্থ আরোহী।

খ. 'বিদগ্ধ আকাশ' বলতে এখানে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে দগ্ধ আকাশকে বোঝানো হয়েছে। গ্রীষ্মকালে সূর্যের প্রচণ্ড তাপে বাংলাদেশের প্রকৃতিতে যেন আগুন ধরে যায়। সূর্যের প্রচণ্ড শাসনে পৃথিবীর বুক বিদীর্ণ হয়। এ সময় প্রখর তাপে আকাশ তৃষ্ণায় কাঁপে। রোদের সুতীব্র তাপে আকাশটা গলে যেতে চায়। উত্তপ্ত সূর্যটা যেন ওই আকাশটাকে ঝলসাতে থাকে।

গ. 'বৃষ্টি' কবিতায় বৃষ্টির দিনে সংবেদনশীল মানুষের মন রসসিক্ত হয়ে ওঠার বিষয়টি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

বর্ষার দিনে প্রকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। সে সময়ে প্রকৃতিতে নেমে আসে প্রাণের জোয়ার। বনের ফুলগুলো বর্ষায় ভিজে নিমিষেই চারপাশ মোহিত করে। বৃষ্টির জলে গাছ-পালা, লতা-পাতা অপার আনন্দে শিহরিত হয়। বৃষ্টির অবিরল জলধারায় প্রকৃতিতে যেন ছন্দ ও সুর বেজে ওঠে।

'বৃষ্টি' কবিতায় বর্ষা প্রকৃতিতে প্রাণের জাগরণ ঘটায়। আর বৃষ্টিই বর্ষার প্রাণ। বৃষ্টিতে বনের কেয়া ফুল শিহরিত হয়। রুক্ষ মাটি যেন প্রাণের স্পন্দন ফিরে পায়। প্রকৃতি স্নিগ্ধ-কোমল ও সজীব হয়ে ওঠে। এ সময়ে মানুষের মন সংবেদনশীল হয়ে আবেগতাড়িত হয়। তার মনে পড়ে সুখময় অতীত, পুরনো স্মৃতি আর ভালোলাগার আল্পনা আঁকে মনে মনে। বৃষ্টি কখনো মনকে বিষণ্ন করে, আবার কখনো জীবনে বাড়ায় বিরহ। মন কাছের মানুষকে পেতে চায়। উদ্দীপকেও কবির মন বৃষ্টির ছোঁয়ায় আকুল হয়ে ওঠে। বিজলী থেকে থেকে চমকায়। সে মন আজ প্রিয়জনকে যেন কিছু বলতে চায়। ঘনঘোর বর্ষায় কবির মন আবেগতাড়িত হয়, রসসিক্ত হয়। 'বৃষ্টি' কবিতায় বর্ষণমুখর দিনে মানুষের চেতনায় সুখময় অতীত ও বিরহ-বেদনার দিকটি নাড়া দেয়। উদ্দীপকেও দেখা যায় এ দিনে কাউকে যেন কাছে পেয়ে মন কিছু বলতে চায়। তাই বলা যায়, 'বৃষ্টি' কবিতার বর্ষার দিনে মানব মনের স্মৃতিকাতরতা আর বিরহ বিষণ্নতার বিষয়টিই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

ঘ. উদ্দীপকটি 'বৃষ্টি' কবিতার একটি বিশেষ ভাবকে ধারণ করেছে, সমগ্রতাকে তুলে ধরেনি।

প্রকৃতি জগতে বৃষ্টি আসে প্রাণের জোয়ার নিয়ে। বৃষ্টির ফলে নদীর দুধারে প্লাবন দেখা দেয়। বৃষ্টির জলে বনের ফুলগুলো অপার আনন্দে শিহরিত হয়। তৃষিত মাঠ প্রাণের স্পন্দনে নেচে ওঠে। প্রকৃতি সজীব হয়। গাছ-পালা, তরুলতা সজীব হয়ে ওঠে। আর বাংলার প্রকৃতি নবসাজে সজ্জিত হয়।

'বৃষ্টি' কবিতায় কবির বর্ণনা অনুযায়ী বৃষ্টির দিনে বিদ্যুৎ রূপসী পরি মেঘে মেঘে সওয়ার হয়। দিক-দিগন্তে প্রকৃতির অপরূপ শোভা বিকশিত হয়। দিগন্তজোড়া পৃথিবী, বন, ধানক্ষেত, নদী নতুন প্রাণ পায়। মানুষের মনেও জাগে বিচিত্র ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। কখনো সুখময় অতীত, কখনো স্মৃতিকাতরতা কিংবা কখনো বিরহ বিষণ্নতা। সব মিলিয়ে 'বৃষ্টি' কবিতাটিতে বৃষ্টির সামগ্রিক একটি রূপ পরিস্ফুটনের চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে উদ্দীপকটিতে শুধু মানুষের অবসর মুহূর্তের একটি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। বৃষ্টির দিনে মন ব্যাকুল হয়। প্রিয়জনকে মনের কথা বলতে ইচ্ছা করে। বর্ষণমুখর দিনে মানুষের বিরহকাতরতা বেড়ে যায়। এভাবে দেখা যায়, উদ্দীপকটি মানুষের মনের একটিমাত্র অনুভূতিকে প্রকাশ করেছে। উদ্দীপকটি যে কোনো দিক থেকে হোক একটিমাত্র অনুভূতিকে প্রকাশ করেছে। এটি পরিপূর্ণ ভাব প্রকাশে সক্ষম নয়। আর 'বৃষ্টি' কবিতায় বৃষ্টির একটি সামগ্রিক দিক ফুটে উঠেছে। কেবল স্মৃতিকাতরতা আর বিরহকাতরতার অনুভূতির জন্য উদ্দীপকটি 'বৃষ্টি' কবিতার একটা ভাবকে প্রকাশ করেছে মাত্র, সমগ্র ভাবকে নয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'বৃষ্টি' কবিতার সামগ্রিক দিক নয়, একটি বিশেষ ভাবকে ধারণ করেছে মাত্র।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

নীল নব ঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে,
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে,
বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর
আউশের ক্ষেত জলে ভর ভর।

ক. কবি বিদ্যুৎ চমকানোকে কীসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

খ. 'বিদ্যুৎ রূপসী পরি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপক ও 'বৃষ্টি' কবিতার সাদৃশ্যের দিকটি তুলে ধরুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'বৃষ্টি' উভয় কবিতায়ই বাংলাদেশের বর্ষার অন্তরলোকের রূপটি ফুটে উঠেছে।" –আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক	২. খ	৩. খ	৪. গ	৫. ক	৬. খ	৭. খ	৮. ক

আমি কোনো আগন্তুক নই

আহসান হাবীব

কবি-পরিচিতি

আহসান হাবীব ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি পিরোজপুর জেলার শঙ্করপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হামিজুদ্দীন হাওলাদার ও মা জমিলা খাতুন। পারিবারিকভাবে আহসান হাবীব সাহিত্য-সংস্কৃতির আবহের মধ্যে বড় হয়েছেন। সেই সূত্রে ছাত্রজীবন থেকেই তিনি লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত হন। পিরোজপুর সরকারি স্কুল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে বরিশাল বিএম কলেজে ভর্তি হন কিন্তু অর্থাভাবে পড়াশুনা অসমাপ্ত রেখে ১৯৩৬ সনে তিনি জীবিকার সন্ধানে কলকাতা চলে যান। এ-সময় থেকেই তাঁর কঠিন জীবন সংগ্রামের এবং প্রকৃত কাব্যসাধনার শুরু। কলকাতার জীবনে আহসান হাবীব সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং মৃত্যু অবধি এ পেশাতেই নিয়োজিত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলাদেশের দৈনিক বাংলা পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক। গভীর জীবনবোধ ও আশাবাদ তাঁর কবিতাকে বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা দান করেছে। তিনি সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং আর্ত মানবতার সপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। অন্যদিকে স্বদেশ ও মাতৃভাষার স্বরূপ-সন্ধান তাঁর কাব্যসাধনার প্রেরণা। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ইউনেস্কো সাহিত্য পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। আহসান হাবীব ১৯৮৫ সালের ১০ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : *রাত্রিশেষ, ছায়া হরিণ, সারা দুপুর, আশায় বসতি, দু'হাতে দুই আদিম পাথর*;

উপন্যাস : *আরণ্য নীলিমা, রাণী খালের সাঁকো*;

শিশু-সাহিত্য : *জোছনা রাতের গল্প, ছুটির দিন দুপুরে, রেলগাড়ি ঝমাঝম, বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর*।

ভূমিকা

'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতাটি কবি আহসান হাবীবের 'দু'হাতে দুই আদিম পাথর' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। মানুষের সাথে তার জন্মভূমির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা তিনি এ কবিতায় তুলে ধরেছেন। কবি এখানে বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও গ্রামীণ জনপদের সঙ্গে মানুষের গভীর সম্পর্ক ও দেশপ্রেমের পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি জন্মভূমির আপন পরিবেশের সাথে নিজেকে একীভূতভাবে দেখেছেন। দেশের প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে কবির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, আর এটাই তাঁর অস্তিত্ব। কেননা মানবজীবন ও জন্মভূমি পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কিত।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- গ্রাম-বাংলার জীবন ও প্রকৃতির বর্ণনা দিতে পারবেন।
- দেশের প্রকৃতি ও মানুষের সাথে কবির নিবিড় সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

আসমানের তারা সাক্ষী
সাক্ষী এই জমিনের ফুল, এই
নিশিরাইত বাঁশবাগান বিস্তর জোনাকি সাক্ষী
সাক্ষী এই জারুল জামরুল, সাক্ষী
পুবের পুকুর, তার ঝাকড়া ডুমুরের ডালে স্থির দৃষ্টি
মাছরাঙা আমাকে চেনে
আমি কোনো অভ্যাগত নই
খোদার কসম আমি ভিনদেশি পথিক নই
আমি কোনো আগন্তুক নই।
আমি কোনো আগন্তুক নই, আমি
ছিলাম এখানে, আমি স্বাপ্নিক নিয়মে
এখানেই থাকি আর
এখানে থাকার নাম সর্বত্রই থাকা –
সারা দেশে।

আমি কোনো আগন্তুক নই। এই
খর রৌদ্র জলজ বাতাস মেঘ ক্লান্ত বিকেলের
পাখিরা আমাকে চেনে
তারা জানে আমি কোনো আত্মীয় নই।
কার্তিকের ধানের মঞ্জরী সাক্ষী
সাক্ষী তার চিরোল পাতার
টলমল শিশির – সাক্ষী জ্যোৎস্নার চাদরে ঢাকা
নিশিন্দার ছায়া
অকাল বার্ধক্যে নত কদম আলী
তার ক্লান্ত চোখের আঁধার –
আমি চিনি, আমি তার চিরচেনা স্বজন একজন। আমি
জমিলার মা'র
শূন্য খা খা রান্নাঘর শুকনো থালা সব চিনি
সে আমাকে চেনে।

হাত রাখো বৈঠায় লাঙলে, দেখো
আমার হাতের স্পর্শ লেগে আছে কেমন গভীর। দেখো
মাটিতে আমার গন্ধ, আমার শরীরে
লেগে আছে এই স্নিগ্ধ মাটির সুবাস।
আমাকে বিশ্বাস করো, আমি কোনো আগন্তুক নই।
দু'পাশে ধানের ক্ষেত
সরু পথ
সামনে ধু ধু নদীর কিনার
আমার অস্তিত্বে গাঁথা। আমি এই উধাও নদীর
মুগ্ধ এক অবোধ বালক।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অবোধ– অবুঝ; নির্বোধ। ***অভ্যাগত–*** গৃহে এসেছে এমন ব্যক্তি; আগন্তুক; নিমন্ত্রিত অতিথি। **আগন্তুক–** অতিথি; অপরিচিত নবাগত ব্যক্তি। ***আসমান–*** আকাশ। **চিরোল–** মাঝখানে চেরা; চিরযুক্ত। ***জমিন–*** ভূমি। ***জমিলার মা'র ... সব চিনি–*** গরীব, অভাবী শ্রেণির প্রতিনিধি জমিলার মা। তাদের রান্নাঘর শূন্যই থাকে সাধারণত। কারণ রান্না করার খাদ্য উপাদান তাদের নেই। যেহেতু রান্না করা হয় না, খাবারও খাওয়া হয়ে ওঠে না। তাই থালা-বাসনও শুকনো থাকে। কবিও সেই অবস্থার কথা জানেন। ***দু' পাশে ধানের ক্ষেত ... আমার অস্তিত্বে গাঁথা–*** কবি গ্রামীণ জীবনেই বেড়ে উঠেছেন। গ্রামের মাঠ-ঘাট পথ-প্রান্তরের মতো ক্ষেতের সরু পথ, তার পাশে ধানের সমারোহ এবং একটু এগিয়ে গেলে বিশাল নদীর কিনার কবির মনের ভেতর, অস্থি-মজ্জায় গ্রথিত হয়ে আছে। এরা সবাই কবির খুবই চেনা-জানা। ***ধানের মঞ্জরী–*** মঞ্জরী হলো মুকুল বা শিষ, ধানের মঞ্জরী হলো ধানের শিষ বা মুকুল। ***নিশিরাইত–*** 'নিশীথ রাত্রি'র গ্রামীণ কথ্যরূপ (গভীর রাত বোঝাতে)। ***নিশিন্দা–*** এক ধরনের গাছ। **বিস্তর–** প্রচুর; ঢের। **ভিনদেশি–** অন্য দেশের; বিদেশি। **পুবের–** পূর্ব দিকের। ***সাক্ষী–*** কোনো কিছু নিজচোখে দেখেছেন এমন কেউ। ***স্নিগ্ধ মাটির সুবাস–*** মায়াবী ও আকর্ষণীয় গ্রামবাংলা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ :

কবি গ্রাম-বাংলারই সন্তান। তিনি এখানে নতুন আসা কোনো অতিথি নন। বাংলার জীবন ও প্রকৃতির মধ্যেই তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। তাই তিনি এখানকার প্রকৃতিকে চেনেন। মানুষকে চেনেন। খুব সূক্ষ্মভাবে, গভীরভাবে চেনেন। তিনি নিজেও তাদের অতি পরিচিত একজন। নিজের বসতিকে ভালোভাবে চেনেন বলেই পুরো দেশকে আপন করে পেতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয় না। এদেশের প্রকৃতির সৌন্দর্যে, মানুষের পেশাগত কাজকর্মে, নদীর উদাত্ত প্রবাহে কবি খুঁজে পান নিজের অস্তিত্ব। তাঁর স্বপ্নও আবর্তিত হয় এসবকে ঘিরেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবি আহসান হাবীবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. সারা দুপুর খ. রাত্রিশেষ গ. ছায়াহরিণ ঘ. আরণ্য নীলিমা

২. 'পাখিরা আমাকে চেনে' চরণটির তাৎপর্য হচ্ছে–
ক. কবি পাখিদের চিরচেনা স্বজন খ. কবি পাখিদের অতিথি
গ. কবি অপরিচিত কেউ নন ঘ. কবি পাখিদের আত্মার আত্মীয়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর
থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর।
আমগাছ, জামগাছ, বাঁশঝাড় যেন,
মিলে-মিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন।

৩. উদ্দীপকটি নিচের কোন কবিতাকে প্রতিফলিত করে–
ক. আমার পরিচয় খ. আমি আগন্তুক নই গ. মানুষ ঘ. বৃষ্টি

৪. উদ্দীপক ও কবিতার মধ্যে সাদৃশ্যের কারণ হল–
i. অন্তরঙ্গতা ii. গাঁয়ের প্রকৃতি iii. স্বজন ভাবনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'এখানেই' কবি কোন নিয়মে থাকেন?
ক. নাগরিকত্বসূত্রে খ. জন্মগতভাবে গ. স্বাপ্নিক নিয়মে ঘ. প্রকৃতিগতভাবে

৬. 'তারা জানে আমি কোন আত্মীয় নই' কথাটির মানে হচ্ছে–

ক. কবি পাখিদের চিরচেনা খ. কবি পাখিদের আত্মীয় গ. কবি পাখিদের প্রতিবেশী ঘ. কবি পাখিদের বন্ধু

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আমার পূর্ববাংলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ
অন্ধকারের তমাল
অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায়
একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ।

৭. উদ্দীপকটির সাদৃশ্য রয়েছে যে কবিতার সঙ্গে–

ক. প্রাণ খ. পল্লিজননী গ. আমি কোনো আগন্তুক নই ঘ. মানুষ

৮. এরূপ সাদৃশ্যের কারণ–

ক. ভাষা ও চিত্রকল্পে খ. প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে গ. জীবনবোধে ঘ. ছন্দ বিন্যাসে

সৃজনশীল প্রশ্ন :

আমি বাংলায় গান গাই
আমি আমার আমিকে চিরদিন
এই বাংলায় খুঁজে পাই।
আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন
আমি বাংলায় বাঁধি সুর
আমি এই বাংলার মায়া ভরা পথে
হেঁটেছি এতটা দূর
বাংলা আমার জীবনানন্দ
বাংলা প্রাণের সুর
আমি একবার দেখি,
বারবার দেখি
দেখি বাংলার মুখ।

ক. কবি আহসান হাবীব কোন পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন?

খ. 'আমি এই উধাও নদীর মুগ্ধ এক অবোধ বালক।' –কবি কেন একথা বলেছেন ?

গ. উদ্দীপকে 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতার কবি জন্মভূমিকে আপন সত্তায় অনুভব করতে চেয়েছেন।" – মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. কবি আহসান হাবীব অধুনালুপ্ত 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন।

খ. বাংলার প্রকৃতি, মাঠ-ঘাট, প্রান্তরের সৌন্দর্যে কবি মুগ্ধ। তিনি অবোধ বালকের মতো বাংলার প্রকৃতির এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে চেয়েছেন।

কবি আহসান হাবীব কৈশোরে বাংলাদেশের গ্রামীণ আবহে বেড়ে উঠেছেন। গ্রামীণ প্রকৃতির মাঠ-ঘাট, পথ-প্রান্তরের মতো খেতের সরু পথ, তার পাশে ধানের সমারোহ এবং একটু এগিয়ে গেলে বিশাল নদীর কিনার কবির মনের ভেতর, অস্থি-মজ্জায় মিশে আছে। বাংলার প্রকৃতি কবিকে এতটাই মুগ্ধ করেছে যে, তিনি এখানকার মানুষ ও প্রকৃতিকে যেমন ভালোভাবে চেনেন, তেমনি তিনিও তাদের চিরচেনা স্বজন। তাই কবি বলেছেন, আমি এই উধাও নদীর মুগ্ধ এক অবোধ বালক।

গ. উদ্দীপকটিতে 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় প্রকাশিত কবির স্বদেশপ্রেমের বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে।

জন্মভূমির সঙ্গে মানুষের নাড়ীর সম্পর্ক। জন্মভূমিতে শিকড় গেড়ে মানুষ সমগ্র দেশকে আপন করে পায়। এর সবকিছুই তার কত চেনা, কত জানা। জন্মভূমির প্রতি মানুষের এই অনুভূতি তুলনাহীন।

উদ্দীপকে একজন কবির আপন সত্তা প্রকাশিত হয়েছে। এই কবি বাংলায় গান করেন এবং বাংলাতেই নিজেকে খুঁজে পান। এই বাংলাতেই বাস করে তিনি নিজের জীবনের আনন্দ খুঁজে পেয়ে থাকেন। 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় কবি আহসান হাবীবও তাঁর অস্তিত্ব নিজের জন্মভূমি বাংলায় খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, তিনি এখানে কোনো আগন্তুক নন। তিনি যেমন ওই আসমান, জমিনের ফুল, জোনাকি, পুকুর, মাছরাঙাকে চেনেন ঠিক তেমনি তারাও তাকে চেনে। কবি বলেছেন, গ্রামীণ জনপদের সঙ্গে তাঁর জীবন বাঁধা। এটিই হচ্ছে তার অস্তিত্ব। এভাবে বলা যায়, 'আমি কোনো আগন্তুক নই'-এর কবির নিজ দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাই উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. দেশপ্রেম মানে হচ্ছে তাকে আপন সত্তায় নিজের অনুভূতিতে অনুভব করা।

জন্মভূমির সঙ্গে মানুষের আজীবনের সম্পর্ক। এর প্রতি ভালোবাসা চিরন্তন। এই মাটিতে শিকড় গেড়েই মানুষ সমগ্র দেশকে আপন করে পায়। জন্মভূমির সবকিছুই তার নিকট মনে হয় কত চেনা, কত জানা। জন্মভূমির প্রকৃতি ও রূপে সে মুগ্ধ হয়। এর মাটি, তার গন্ধ, তার নিকট অতি আপন। তার শরীরে লেগে থাকে এই স্নিগ্ধ মাটির সুবাস। জন্মভূমির প্রতি মানুষের এই ভালোবাসার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন হলেও অনুভূতির জগতে তা অভিন্ন রূপ ধারণ করে।

উদ্দীপকের কবি নিজেকে বাংলার মাটিতে খুঁজে পান। এর মায়াভরা পথ দিয়ে তিনি অনেক হেঁটেছেন। কবি বলেছেন, তিনি বাংলাকে চিরদিন চেনেন। বাংলায় স্বপ্ন দেখা তার চিরকালীন কামনা। বাংলা তার নিকট জীবনানন্দ। তিনি বাংলার মুখ একবার নয়, বার বার দেখতে চেয়েছেন। 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায়ও কবি তার চিরচেনা পরিবেশ অর্থাৎ এই বাংলার জনপদে নিজের শিকড় সন্ধান করেছেন। কবি বলেছেন– পাখি, কার্তিকের ধান কিংবা শুধু শিশির নয়, তিনি এই জনপদের মানুষকেও ভালোভাবে চেনেন। তিনি যেমন ওই আসমান, জমিনের ফুল, জোনাকি, পুকুর, মাছরাঙাকে চেনেন, তেমনি তারাও তাকে চেনে। এই গ্রামীণ জনপদের সঙ্গেই কবির জীবন বাঁধা।

জন্মভূমির সঙ্গে মানুষ গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এর সবকিছুই তার অতি আপনজন। জন্মভূমির অস্তিত্ব তার অস্থি-মজ্জায়। এভাবেই সে সমগ্র দেশকে আপন করে পায়। নিজের সত্তা দিয়ে অনুভব করে। 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় এই অনুভবই কবি আহসান হাবীব গভীর মমতায় তুলে ধরেছেন। উদ্দীপকের কবিও বাংলার সবকিছুকে নিজের সত্তায় অনুভব করেন। আর অনুভব করেন বলেই বাংলার প্রতি তার গভীর মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কবি এবং 'আমি কোনো আগন্তুক নই'-এর কবি জন্মভূমিকে একান্তভাবে আপন সত্তায় অনুভব করেছেন।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা
ভাওয়াল আমার প্রাণ!
আমি তার নির্বাসিত অধম সন্তান
তার সে মলয় বায়, হরিণী চমকি চায়,
অচলে উছলে পড়ে গলিয়ে পাষাণ;
তাহারি মধুর শ্বাসে, সুধা-সোমরস-বাসে
দেবতা ছাড়িয়া আসে নন্দন উদ্যান!

ক. কবির অস্তিত্বে গাঁথা রয়েছে কোনটি?

খ. 'আমি কোন আগন্তুক নই।' –বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতার কোন দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক এবং 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতার দেশপ্রেম অভিন্ন।" –বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ	২. ক	৩. খ	৪. ঘ	৫. খ	৬. ক	৭. গ	৮. খ

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা

শামসুর রাহমান

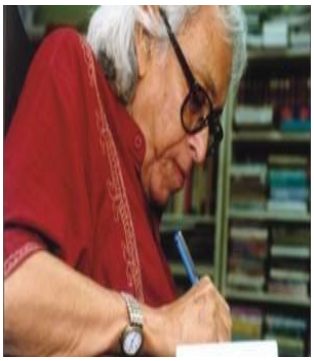

কবি-পরিচিতি

শামসুর রাহমান ১৯২৯ সালের ২৪শে অক্টোবর ঢাকা শহরে তাঁর নানাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার পাড়াতলী গ্রাম। তাঁর পিতা মোখলেসুর রহমান চৌধুরী ও মাতা আমেনা খাতুন। শামসুর রাহমান ১৯৪৫ সালে ঢাকার পোগোজ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হয়েও চূড়ান্ত পরীক্ষা না দিয়ে পাসকোর্সে বিএ পাশ করেন। তাঁর পেশা ছিল সাংবাদিকতা। আঠারো বছর বয়সে তিনি লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর 'বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', 'স্বাধীনতা তুমি', 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা', 'সফেদ পাঞ্জাবি', 'আসাদের শার্ট' প্রভৃতি কবিতায় উঠে এসেছে বাঙালি জাতির স্বপ্ন ও ভবিষ্যত। বিষয়ে, আঙ্গিকে, উপস্থাপনায় তাঁর কবিতা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের প্রত্যাশা, হতাশা, বিচ্ছিন্নতা, বৈরাগ্য ও সংগ্রাম তাঁর কবিতায় সার্থকভাবে বিধৃত। ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিলিট উপাধিতে ভূষিত করে। এছাড়া তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক ও স্বাধীনতা পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০০৬ সালের ১৭ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থ :

প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিজ বাসভূমে, বন্দী শিবির থেকে, দুঃসময়ের মুখোমুখি, ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা, আমি অনাহারী, বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়, গৃহযুদ্ধের আগে, হরিণের হাড়, মানব হৃদয়ে নৈবেদ্য সাজাই।

ভূমিকা

'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' শীর্ষক কবিতাটি 'শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামক গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। কবিতাটি কবির 'বন্দী শিবির থেকে' নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীনতা অর্জনে বাঙালির সংগ্রামী চেতনা এবং তাঁদের মহান আত্মত্যাগের মহিমা কবি সুন্দরভাবে এই কবিতায় প্রকাশ করেছেন। এখানে কবি স্বাধীনতার জন্য এদেশের সর্বস্তরের মানুষের আত্মত্যাগ, পাক-হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ, মুক্তিকামী মানুষের প্রতীক্ষার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। কবি স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস থেকে স্বাধীনতাকে রক্ষা ও অর্থবহ করে তুলতে সকলকে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- স্বাধীনতার জন্য বিচিত্র মানুষের আত্মত্যাগ বর্ণনা করতে পারবেন;
- স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও অনুভবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায় ?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন ?

তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙল,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটাল যত্রতত্র।
তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।
তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার
ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করল একটা কুকুর।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিল পিতা-মাতার লাশের উপর।

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায় ?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন ?
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে থুত্থুড়ে এক বুড়ো
উদাস দাওয়ায় বসে আছেন – তাঁর চোখের নিচে অপরাহ্নের
দুর্বল আলোর ঝিলিক, বাতাসে নড়ছে চুল।

স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
মোল্লাবাড়ির এক বিধবা দাঁড়িয়ে আছে
নড়বড়ে খুঁটি ধরে দগ্ধ ঘরের।

স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য থালা হাতে
বসে আছে পথের ধারে।

তোমার জন্যে,
সগীর আলী, শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক,
কেষ্ট দাস, জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা,
মতলব মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি,
গাজী গাজী বলে যে নৌকা চালায় উদ্দাম ঝড়ে,
রুস্তম শেখ, ঢাকার রিকশাওয়ালা, যার ফুসফুস
এখন পোকার দখলে
আর রাইফেল কাঁধে বনে জঙ্গলে ঘুরে-বেড়ানো
সেই তেজি তরুণ যার পদভারে

একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হতে চলেছে –
সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে, হে স্বাধীনতা।

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত
ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,
নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাংলায়
তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অধীর– অস্থির; ব্যাকুল। **অপরাহ্ণ–** বিকাল। **আর্তনাদ–** কাতর চিৎকার। **খাণ্ডবদাহন–** ভীষণ অগ্নিকাণ্ড। **জোয়ান–** যুবক; প্রাপ্তবয়স্ক লোক। ***তুমি আসবে বলে ... ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো–*** স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালিদের ওপর বীভৎস ও ভয়ংকর আক্রমণ চালায়; তারা গ্রামের পর গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে দেয়; তাদের সেই আক্রমণ থেকে ছাত্রদের ছাত্রাবাস, গরীব মানুষের থাকার জায়গা, বস্তিও রক্ষা পায়নি; পাকিস্তানি সেনারা ছাত্রাবাস ও বস্তিতেও আক্রমণ করে, এবং সেখানকার মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে এবং পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ***থুত্থুড়ে এক বুড়ো–*** বয়সের ভারে বিধ্বস্ত লোক, যার বয়স অনেক হয়েছে এবং চলাচল করতে যার কষ্ট হয়। **দাওয়া–** বারান্দা, উঠান। **দামামা–** ঢাকজাতীয় রণবাদ্য। **দিগ্বিদিক–** সর্বদিক। **নিশান–** পতাকা; কেতন। **প্রতীক্ষা–** অপেক্ষা। **বাস্তুভিটা–** বহুকালের বসতভূমি পুরুষানুক্রমে যে বাড়িতে বাস করা হয়। **বিধ্বস্ত–** বিলুপ্ত, চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত। **ভগ্নস্তূপ–** স্তূপাকার ধ্বংসাবশেষ। ***যত্রতত্র–*** যেখানে সেখানে; সব জায়গায়। ***রুস্তম শেখ ... এখন পোকার দখলে–*** রুস্তম শেখ নামের এক রিক্‌শাওয়ালা যিনি যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন; মৃত অবস্থা বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে 'যার সুখদুখ এখন পোকার দখলে'। ***সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর–*** হরিদাসী বিধবা হলো। সনাতন ধর্মের মেয়েদের বিয়ের পর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেওয়া হয়। তার স্বামী মারা গেলে সেই সিঁদুর মুছে ফেলা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের দেশের এমন অনেক হরিদাসীর স্বামী মুক্তিযুদ্ধ করতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন। হরিদাসীর স্বামীও শহিদ হয়েছেন– এ বিষয়টি বোঝানোর জন্য বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ :

স্বাধীনতা মানুষের পরম চাওয়া। মানুষ বিচিত্র অবস্থার মধ্যে থাকে। বিচিত্র শ্রেণি-পেশা-ধর্ম-বর্ণ তাদের। কিন্তু স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় তাদের মধ্যে ভেদ নেই। যার যার অবস্থান থেকে স্বাধীনতার জন্য মানুষ ত্যাগ স্বীকার করেছে। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, পুড়িয়ে দিয়েছে শহর ও গ্রামের লোকালয়। কিন্তু সবকিছু হারিয়েও বাংলার মানুষ আশা ছাড়েনি। স্বাধীনতা সংগ্রামের একদিকে ছিল বিসর্জন, অন্যদিকে সম্মুখ-যুদ্ধের সাহস আর বীরত্ব। বহু বিচিত্র মানুষের নানামুখী অংশগ্রহণে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল কার?

ক. সকিনা বিবির   খ. হরিদাসির
গ. আমিনা বিবির   ঘ. নির্মলা দাসির

২. সনাতন ধর্মে সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলা হয় যে কারণে–

ক. স্বামী সমুদ্র পাড়ি দিলে   খ. স্বামী বিদেশ গেলে
গ. স্বামী যুদ্ধে গেলে   ঘ. স্বামী মারা গেলে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

অলভ্য জয়ের লোভে জ্বালায় শহর, গ্রামে গ্রামে
প্রাচীন সংহতি ভেঙ্গে ভগ্ন স্তূপে দূরের উল্লুক।

৩. উদ্দীপকটি কোন কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. সাহসী জননী　　খ. প্রাণ

গ. তোমাকে পাওয়ার জন্য,হে স্বাধীনতা　　ঘ. জীবনসঙ্গীত

৪. উদ্দীপকের চরণদ্বয় নিচের কোন পঙ্‌ক্তিটির উপজীব্য?

i. তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা

ii. তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম

iii. হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোর শূন্য থালা হাতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতাটি শামসুর রাহমানের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?

ক. রৌদ্র করোটিতে　　খ.বন্দী শিবির থেকে

গ. বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে　　ঘ. হরিণের হাড়

৬. 'তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিল পিতা-মাতার লাশের উপর।' চরণটিতে রয়েছে–

ক. অবোধ শিশুর আনন্দ　　খ. গণআন্দোলনের রূপ

গ. শিশুর বিদ্রোহ　　ঘ. স্বাধীনতার স্বপ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে মিল রয়েছে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার–

i. শ্রমিক শ্রেণির　　ii. স্বাধীনতা বিরোধীদের　　iii. আপামর জনসাধারণের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i ও ii

৮. উদ্দীপক ও 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতাটির সাদৃশ্যের মূলে রয়েছে–

ক. দেশাত্মবোধ　　খ. সাহসিকতা

গ. নিপীড়ন　　ঘ. ধ্বংসযজ্ঞ

সৃজনশীল প্রশ্ন :

তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ,
তুমি ফিরে এসেছ তোমার লাল সূর্য আঁকা পতাকার ভেতরে
যার আলোয় এখন রঞ্জিত হয়ে উঠেছে সাহসী বদ্বীপ,
তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ
তুমি ফিরে এসেছ তোমার অনাহারী শিশুটির কাছে
ফিরে এসেছ তোমার প্লাবনের কোমল পলিমাটিতে
যার মুঠোর ভেতরে এখন একটি ধানের বীজ ;

ক. 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?

খ. 'আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়।' –বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার কোন দিকটির মিল রয়েছে? আলোচনা করুন।

ঘ. উদ্দীপকটিতে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা' কবিতার মূলভাবটি প্রকাশিত হয়েছে কি? –উত্তরের সপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' নামক কবিতাটি 'শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

খ. বাংলার মানুষকে স্বাধীনতার জন্য পৃথিবীর বুকে অনেকবার রক্ত দিতে হয়েছে।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার অর্জনের জন্য এদেশের মানুষ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাকিস্তানি বাহিনী এদেশে ছাত্রাবাসগুলোতে আক্রমণ করে। নির্মমভাবে গণহত্যা চালায়। পুড়িয়ে দেয় দেশের শহর ও গ্রামের লোকালয়। সম্ভ্রম হারায় অনেক নারী। যুদ্ধে আত্মত্যাগ করে অনেক নারী ও পুরুষ। রক্তের গন্ধ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তবুও মাথা নত করেনি বাঙালি। বার বার এদেশ অত্যাচারীর অত্যাচারে রক্তগঙ্গায় ভেসেছে। এ কারণেই কবি বলেছেন– 'আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?'

গ. 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার শেষ অংশ যেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তার কথা রয়েছে সে অংশের সঙ্গে উদ্দীপকের মিল রয়েছে।

বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। অনেক রক্তের বিনিময়ে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। এর জন্য বাঙালিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে নয় মাস। স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে এদেশের লাখো মানুষকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। নির্যাতিত ও বিধবা হতে হয়েছে অসংখ্য নারীকে। ধ্বংস হয়েছে অজস্র জনপদ। উজাড় হয়েছে অনেক বস্তি ও ছাত্রাবাস। আর এর বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতার রক্তলাল পতাকা।

উদ্দীপকে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে। কবি এখানে নতুন বাংলাদেশকে স্বাগত জানিয়েছেন। কবি বলেছেন,'তুমি ফিরে এসেছ তোমার লাল সূর্য আঁকা পতাকার ভেতরে, ফিরে এসেছ তোমার অনাহারী শিশুটির কাছে, ফিরে এসেছ তোমার প্লাবনের কোমল পলিমাটিতে।' বস্তুত ফিরে আসা বলতে মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে আসাকেই বোঝানো হয়েছে। অন্যদিকে কবিতায় দেখতে পাই যুদ্ধের সময় অনেক রক্তগঙ্গা বইয়ে আমাদের স্বাধীনতা এসেছে। পিতা-মাতার লাশের উপর হামাগুড়ি দিয়েছে অনেক অবুঝ শিশু। সম্ভ্রম হারিয়েছে অনেক নারী। নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে উদ্দীপকের পতাকার মতো লাল পতাকা উড়িয়ে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বলা যায়, এভাবে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার বিষয়টিতে উদ্দীপকের সঙ্গে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে,হে স্বাধীনতা' কবিতার মিল রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকটিতে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার মূল ভাবটি প্রকাশিত হয়নি।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। এ অধিকার অনুভবেরও বটে। কিন্তু পাকিস্তানিরা বাঙালি জাতির এ অধিকার হরণ করেছিল। এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আপামর বাঙালি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাকিস্তানি বাহিনী এদেশে গণহত্যা চালায়। পুড়িয়ে দেয় গ্রাম ও শহরের অজস্র লোকালয়। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং রক্তগঙ্গার বিনিময়ে অবশেষে স্বাধীনতা অর্জিত হয়। বাংলার আকাশে ওঠে স্বাধীনতার লাল সূর্য।

উদ্দীপকে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে অভিবাদন জানানো হয়েছে। উদ্দীপকের কবি এখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আবেগকে সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন। কবির স্বপ্নের স্বাধীনতা ফিরে এসেছে বাংলার কোমল পলিমাটিতে, অনাহারী শিশুটির কাছে। উদ্দীপকটিতে যুদ্ধের কোনো বর্ণনা দেওয়া হয়নি। এছাড়া বাঙালি জাতির মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় না উদ্দীপকে। অন্যদিকে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতাটিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আবহকে তুলে ধরা হয়েছে। বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধ বিস্তৃত পরিসরে ফুটে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাঙালির রক্তে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয় পাকসেনারা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য অনেক নারী সম্ভ্রম হারিয়েছেন, অনেক নবজাতক হারিয়েছে মা-বাবাকে। আর্তনাদ করেছে কুকুরও। মুক্তিযুদ্ধে বাংলার শ্রমিক, কৃষক, জেলে প্রমুখ সাধারণ

মানুষও আত্মত্যাগ করে। এভাবে দেখা যায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের চিত্রায়ন রয়েছে কবিতাটিতে।

উদ্দীপকে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের কথা বলা হয়েছে। সেখানে নতুন স্বাধীন বাংলাদেশকে অভিবাদন জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত মুক্তিযুদ্ধের কথা বর্ণিত হয় নি। আর 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতাটিতে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বাপর প্রসঙ্গসহ মুক্তিযুদ্ধের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায়, 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতাটির মূল ভাব উদ্দীপকে ফুটে ওঠেনি। আংশিক চিত্রকে ধারণ করেছে মাত্র।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল অংশ :

স্বাধীনতা তুমি
রবি ঠাকুরের অজর কবিতা,অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুলের ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা–

ক. শাহবাজপুরের কৃষকের নাম কী?
খ. 'তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।' –উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপক ও 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার বৈসাদৃশ্যগুলো আলোচনা করুন।
ঘ. 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় রয়েছে স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে স্বাধীনতার অনাবিল আনন্দ।' –মন্তব্যটি বিচার করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. ঘ ৩. গ ৪. খ ৫. খ ৬. ঘ ৭. গ ৮. ক

অডিও/ভিডিও

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বর্তমানে বিটিভি/বংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।

শিক্ষার্থীবন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

সাঁকোটা দুলছে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কবি-পরিচিতি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৩৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মাদারিপুর জেলার মাইঝপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন একজন স্কুলশিক্ষক, মাতা মীরা গঙ্গোপাধ্যায়। মাত্র চার বছর বয়সে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৩ সালে 'কৃত্তিবাস' নামক কবিতা পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে তিনি তরুণ প্রজন্মের কবিদের দৃষ্টি কাড়েন। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, সাংবাদিক ও নিবন্ধকার। তবে পেশাগত দিক থেকে তিনি ছিলেন সাংবাদিক। তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার জীবনানন্দ-পরবর্তী পর্যায়ের অন্যতম প্রধান কবি। একইসঙ্গে তিনি আধুনিক ও রোমান্টিক কবি। কবিতা ও কথাসাহিত্যে যে ভুবন তিনি রচনা করেছেন সেখানে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মানবীয় প্রেমের এক অসামান্য জগৎ তৈরি হয়েছে। তিনি 'নীললোহিত', 'সনাতন পাঠক' ও 'নীল উপাধ্যায়' প্রভৃতি ছদ্মনামে লিখেছেন। সবমিলিয়ে তিনি দুইশ'র বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, বঙ্কিম পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কারসহ বিভিন্ন সম্মাননায় ভূষিত হন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২০১২ সালের ২৩ অক্টোবর কলকাতায় নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : *এক এবং কয়েকজন, আমার স্বপ্ন, জাগরণ হেমবর্ণ, দাঁড়াও সুন্দর, মন ভালো নেই, স্বর্গনগরীর চাবি, স্মৃতির শহর, হঠাৎ নীরার জন্য, রাত্রির রঁদেভূ*;

উপন্যাস : *অরণ্যের দিনরাত্রি, আত্মপ্রকাশ, প্রতিদ্বন্দ্বী, সেই সময়, পূর্ব-পশ্চিম, প্রথম আলো*;

শিশুসাহিত্য : *কাকাবাবু-সন্তু*।

ভূমিকা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাত্রির রঁদেভু' কাব্যগ্রন্থের 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতাটি 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থ থেকে সম্পাদনা করে সংকলন করা হয়েছে। মানুষের জীবনে শৈশবের মধুর স্মৃতি ও বন্ধুত্বের উপর গুরুত্ব দিয়েই লেখক তাঁর এই কবিতাটি রচনা করেছেন। দেশ বিভাগে লেখক তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও তাঁর মনে যে এ দেশের প্রতি এবং দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা তাই তিনি এ কবিতাটিতে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- গ্রাম-বাংলার মনোরম পরিবেশের বিবরণ দিতে পারবেন;
- হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জীবনের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- দেশভাগের কারণে বিচ্ছিন্ন মানুষের বেদনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

মনে পড়ে সেই সুপুরি গাছের সারি
তার পাশে মৃদু জ্যোৎস্না মাখানো গ্রাম
মাটির দেয়ালে গাঁথা আমাদের বাড়ি
ছোট ছোট সুখে স্নিগ্ধ মনস্কাম।

পড়শি নদীটি ধনুকের মতো বাঁকা
উরু ডোবা জলে সারাদিন খুনশুটি
বাঁশের সাঁকোটি শিশু শিল্পীর আঁকা
হেলানো বটের ডালে দোল খায় ছুটি।

এপারে ওপারে ঢিল ছুঁড়ে ডাকাডাকি
ওদিকের গ্রামে রোদ্দুর কিছু বেশি
ছায়া ঠোঁটে নিয়ে উড়ে যায় ক'টি পাখি
ভরা নৌকায় গান গায় ভিনদেশি।

আমার বন্ধু আজানের সুরে জাগে
আমার দু'চোখে তখনো স্বপ্নলতা
ভোরের কুসুম ওপারে ফুটেছে আগে
এপারে শিশির পতনের নীরবতা।

আমার বন্ধু বহু ঝগড়ার সাথী
কথায় কথায় এই ভাব এই আড়ি
মার কাছে গিয়ে পাশাপাশি হাত পাতি
গাব গাছে উঠে সে-হাতেই কাড়াকাড়ি।

আমার বন্ধু দুনিয়াদারির রাজা
মিথ্যে কথায় জগৎ সভায় সেরা
দোষ না করেও পিঠ পেতে নেয় সাজা
আমি দেখি তার সহাস্য মুখে ফেরা।

আমাদের ছুটি মন বদলের খেলা
আমাদের ছুটি অরণ্যে খোঁজাখুঁজি
আমাদের ছুটি হাসি–কান্নার বেলা
আমাদের ছুটি ইঙ্গিতে বোঝাবুঝি।

বন্ধু হারালে দুনিয়াটা খাঁ খাঁ করে
ভেঙে যায় গ্রাম, নদীও শুকনো ধু ধু
খেলার বয়েস পেরোলেও একা ঘরে
বার বার দেখি বন্ধুরই মুখ শুধু।

সাঁকোটির কথা মনে আছে, আনোয়ার?
এত কিছু গেল, সাঁকোটি এখনো আছে
এপার ওপার স্মৃতিময় একাকার
সাঁকোটা দুলছে, এই আমি তোর কাছে।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

ইঙ্গিত– ইশারা; সঙ্কেত। ***কথায় কথায় এই ভাব এই আড়ি–*** সম্পর্কের অবস্থা বোঝানো হয়েছে; নিকটজনের সাথে নানা ধরনের মনোমালিন্য হয়ে থাকে; কথা বলতে বলতে হয়তো দু'একটি কথায় একে অপরের মাঝে মনমালিন্য হয়, অভিমান করে কথা বন্ধ রাখে, আবার সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে যায়– এ অবস্থা বোঝানো হয়েছে। **কুসুম–** ফুল। ***খুনসুটি–*** কৃত্রিম বিবাদ; কপট রাগ; রাগের ছল বা অভিমান। **পেরোলেও–** পার হলেও। ***ভরা নৌকায় গান গায় ভিন দেশি–*** নদীর দু'পাড়ের মানুষ যাদের চেনে না তেমন কারো নৌকা নিয়ে যাতায়াত করতে দেখছে। দেখছে তাদেরই নদী দিয়ে অন্য কোনো এলাকার বা ভিনদেশি কোনো মানুষ তার ভরা নৌকায় মনের আনন্দে গান গেয়ে চলে যাচ্ছে। ***মনস্কাম–*** মনের আশা; আন্তরিক কামনা; বাসনা। **মৃদু–** ক্ষীণ; অনুজ্জ্বল। **সহাস্য–** হাস্যরত। **সাঁকো–** সেতু; পুল।

সারসংক্ষেপ :

নদীর দুই পারে স্নিগ্ধ সুন্দর দুটি গ্রাম। মাঝে বাঁশের সাঁকো। এ গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাস। আর ওদিকের গ্রামে মুসলমানের। দুই গ্রামের দুটি ছেলেতে বেজায় বন্ধুত্ব। ঝগড়া-বিবাদ হয়। আবার মিটেও যায়। সারাদিন দুজনে মিলেমিশে থাকে। এক গাছের ফল ভাগ করে খায়। সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে আনন্দময় দিন কাটায়। দেশভাগ দুই বন্ধুর মধ্যে বিচ্ছেদ নিয়ে আসে। এ ঘটনা দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্কেও ফাটল ধরায়। কিন্তু দূরে গেলেই মনের টান শেষ হয়ে যায় না। স্মৃতির সাঁকোটা মুছে যাওয়ার নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতায় কবির বন্ধুর নাম কী?
ক. কামাল খ. আনোয়ার গ. খবিরউদ্দিন ঘ. আসলাম

২. 'কথায় কথায় এই ভাব এই আড়ি' বলতে বোঝানো হয়েছে–
ক. সম্পর্কের উষ্ণতা খ. সম্পর্কহীনতা গ. সম্পর্ক ছেড়ে দেওয়া ঘ. সম্পর্ক জুড়ে নেওয়া

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

'বাংলার ভাগ করিবার পারিছ, কিন্তু দিলটারে ভাগ করবার পারো নাই।'

৩. উদ্দীপকটি 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতার কোন চরণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?
i. ভেঙে যায় গ্রাম, নদীও শুকনো ধুধু ii. আমাদের ছুটি মন বদলের খেলা
iii. এত কিছু গেল, সাঁকোটি এখনো আছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৪. উদ্দীপক এবং 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতায় যে বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে–
ক. স্মৃতি খ. দেশভাগ গ. বন্ধুত্ব ঘ. সংস্কৃতি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতায় কবির বন্ধু কীসের রাজা?
ক. স্বর্গের রাজা খ. মর্ত্যের রাজা গ. দুনিয়াদারীর রাজা ঘ. পাতালের রাজা

৬. বন্ধুত্ব হারালে দুনিয়াটা যেমন হয়–
ক. আনন্দে ভরে ওঠে খ. বিষাদে ভরে ওঠে গ. খাঁ খাঁ করে ওঠে ঘ. কোলাহলে ভরে ওঠে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

টোকা দিলে ঝরে পড়বে পুরনো ধুলো
চোখের কোণায় জমা এককোঁটা জল।

৭. উদ্দীপকে 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতার কোন দিকটি প্রকাশিত হয়েছে?
ক. বিরহ খ. আত্মনিবেদন গ. স্মৃতি ঘ. বিস্মৃতি

৮. উদ্দীপকের অনুভব 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতার যে চরণে প্রকাশ পেয়েছে–
ক. আমাদের ছুটি ইঙ্গিতে বোঝাবুঝি। খ. আমি দেখি তার সহাস্য মুখে ফেরা
গ. খেলার বয়স পেরোলেও একা ঘরে ঘ. এপার ওপার স্মৃতিময় একাকার

সৃজনশীল প্রশ্ন :

অনেক দিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নাই। একদিন শোনা গেল সে মর-মর। আর একদিন শোনা গেল, মালোপাড়ার এক বুড়া মালো তাহার চিকিৎসা করিয়া এবং তাহার মেয়ে বিলাসী সেবা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ হইতে এ যাত্রা ফিরাইয়া আনিয়াছে। অনেক দিন তাহার মিষ্টান্নের সদ্ব্যয় করিয়াছি– মনটা কেমন করিতে লাগিল, একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম। তাহার পোড়োবাড়িতে প্রাচীরের বালাই নাই। স্বচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরের দরজা খোলা, বেশ উজ্জ্বল, একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঠিক সুমুখেই তক্তপোষের উপর পরিষ্কার ধবধবে বিছানায় মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে, তাহার কঙ্কালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায়, বাস্তবিক যমরাজ চেষ্টার ত্রুটি কিছু করেন নাই, তবে শেষ পর্যন্ত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ক. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকার নাম কী?
খ. 'খুনসুটি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকটি 'সাঁকোটি দুলছে' কবিতার কোন বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।
ঘ. "বিচ্ছিন্নতা নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসার সম্পর্কই মৌলিক।" –উদ্দীপক ও 'সাঁকোটি দুলছে' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকার নাম হচ্ছে 'কৃত্তিবাস'।

খ. 'খুনসুটি' বলতে বোঝানো হয়েছে কপট রাগ বা অভিমানকে।
মানুষের জীবনক্রমের প্রাথমিক পর্যায় হচ্ছে শৈশব। শৈশবে খেলার অনেক সঙ্গী-সাথী থাকে। 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতায় কবির ছেলেবেলার বন্ধু আনোয়ার। কবির সঙ্গেই তার বোঝাপড়া। কবি যেখানে বড় হয়েছেন সেখানে বাড়ির পাশেই ধনুকের মতো বাঁকা একটি নদী আছে। সেখানে কবি ও তার বন্ধু আনোয়ার সারাদিন খেলা করতেন। নদীর জলে উরু ডুবিয়ে তাদের আনন্দ হত। এরই মধ্যে তাদের ঝগড়া হত। তারা কৃত্রিম বিবাদে লিপ্ত হতেন। ক্ষণিক সময়ের ব্যবধানে তাদের আবার মিল হয়ে যেত। বন্ধুত্বের মধ্যে কপট রাগ বা রাগের ছলনাকে কবি 'খুনসুটি' বলে উল্লেখ করেছেন।

গ. বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতার বিষয়টিতে উদ্দীপক এবং 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।
মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে সে একাকী বাস করতে পারে না। তাই তার বন্ধুত্বের প্রয়োজন হয়।বন্ধুত্বের বন্ধন হৃদয়ের প্রাণ প্রবাহ। হৃদয়ের টান, মমত্ববোধ, ব্যক্ত-অব্যক্ত ভাব প্রকাশের একটা বলয় হচ্ছে বন্ধুত্বের বন্ধন। বন্ধুত্ব অনুভবের ও উপলব্ধির বিষয়। বন্ধুরা একসঙ্গে মিলিত হয় প্রাণের টানে, প্রাণের প্রয়োজনে।
উদ্দীপকে দেখি মৃত্যুঞ্জয়ের এক বন্ধু উদ্দীপকের কথক তার অসুস্থতার খবর পেয়ে খোঁজ নিতে আসে। উদ্দীপকের কথক এসে দেখে তার বন্ধু মৃত্যুঞ্জয় সাপুড়ের মেয়ে বিলাসীর আশ্রয়ে রয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় হচ্ছে কায়স্থ ঘরের সন্তান আর বিলাসী নিচু ঘরের মেয়ে। সামাজিক কারণে বিলাসী এবং মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক তৈরি হতে পারে না। ফলে উদ্দীপকের কথককে সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকিয়ে মৃত্যুঞ্জয়কে দেখতে আসতে হয়। গল্পকথক বন্ধুত্বের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। সামাজিক কোনো বাধা বা ধর্মীয় কোনো প্রতিবন্ধকতা বন্ধুত্বের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাচীর তুলে দাঁড়াতে পারেনি। 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতায় কবি'র দিন কাটে বন্ধু আনোয়ারের সঙ্গে। বন্ধুর সঙ্গে কবি'র এই আড়ি আবার এই ভাব। দুজনেই প্রশ্রয় পায় মায়ের কাছে। এভাবেই হয়তো দিন কেটে যেতে পারতো। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ হলে দু'বন্ধু দুজনের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কবি সহজে ভুলতে পারেননি তার বন্ধু আনোয়ারকে। বড় হয়ে তাই বন্ধু আনোয়ারের কথা মনে পড়ে। উদ্দীপকের কথক সমাজের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে রাতের আঁধারে বন্ধু

মৃত্যুঞ্জয়কে দেখতে এসেছে। 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতায়ও বন্ধু বন্ধুর জন্য দুঃসহ ও মর্মান্তিক পীড়নে ভুগেছে। উভয়ক্ষেত্রেই বন্ধুর জন্য অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে। তাই বলা যায়, বন্ধুর জন্য ভালোবাসা প্রকাশের বিষয়টিতে উদ্দীপক ও 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপক এবং 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতায় মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসার মৌলিক দিকটিই ফুটে উঠেছে।

বন্ধুত্বের সম্পর্ক বড়ই মধুর। এ সম্পর্কে হৃদয়ের অনাবিলতা থাকে। অন্তরের টান থাকে দুর্বার। বন্ধু সহমর্মী ও হৃদয়স্পর্শী। এ সম্পর্কে ধর্ম, গোত্র, বর্ণ ও জাতীয়তার কোনো বালাই থাকে না। কোনো বাধার দেয়ালই বন্ধুত্বের দিলটাকে ভাগ করতে পারে না। বন্ধুদের মধ্যে কখনো আড়ি হয়। আবার চলে মন বদলের খেলা। কখনো দেখা যায় আনন্দের প্রাণপ্রবাহ, আবার কখনো কান্নার ভেলা। বিশেষ করে শৈশবের বন্ধুত্ব বড় স্মৃতিময়। শৈশবের বন্ধুদের কথা কখনো ভোলা যায় না। এককথায় বলা যায় মানুষের জীবনে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রূপ-রস ও আনন্দে ভরপুর।

উদ্দীপকে গল্পকথক তার বন্ধু মৃত্যুঞ্জয়ের কথা বলেছে। সে ছোটবেলায় মৃত্যুঞ্জয়ের মিষ্টির সদ্ব্যবহার করেছে। বন্ধুর প্রতি তার কৃতজ্ঞতাবোধ রয়েছে। সমাজের নির্মমতার কারণে সে প্রকাশ্যে বন্ধুকে দেখতে যেতে পারেনি। তবে সন্ধ্যার অন্ধকারে ঠিকই মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা করতে যায়। এক্ষেত্রে সমাজ কিংবা ধর্ম তাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। অন্যদিকে 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতায় আরও মর্মস্পর্শী রূপে বন্ধুত্বের বিরহ বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটিতে কবি এবং তার বন্ধু আনোয়ার বন্ধুবৃত্তের মধ্যে বসবাস করেই আনন্দের শৈশব কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু গোল বাঁধায় ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ। দু'বন্ধু দুজনের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। বড় দুঃসহ এ স্মৃতি, বড় মর্মান্তিক। বড় হয়ে তাই কবির মনে পড়ে তার বন্ধুর কথা। মনে পড়ে বাড়ির পাশের নদীর উপর সেতুটির কথা। কবি বলেন,'এপার ওপার স্মৃতিময় একাকার সাঁকোটা দুলছে, এই আমি তোর কাছে।' তাঁর কাছে মনে হয়েছে সাঁকোটি যেন এখনো কবি ও তার বন্ধু আনোয়ারের বন্ধুত্বের প্রতীক হয়ে আজও দুলছে। এভাবেই কবির ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে তার বন্ধুর প্রতি। উদ্দীপকে যদিও প্রেক্ষাপটটি ভিন্ন তথাপি সেখানেও মৃতুঞ্জয়ের প্রতি গল্পকথকের অগাধ ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে। বন্ধুত্বের বন্ধন চিরন্তন। কোনো বাধাই বন্ধুত্বের সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারে না। 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতায় 'সাঁকো'টি এমন এক বন্ধুত্বের প্রতীক হয়ে আছে। কবির কাছে মনে হয় সেই সাঁকোটি যেন এখনো দুলছে। এই সাঁকোটিই যেন মিলিয়ে দিতে চাইছে শৈশবের দুই বন্ধুকে। যদিও বাস্তবে এরকম ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নেই। উদ্দীপকেও দেখা যায় মৃত্যুঞ্জয়ের বন্ধু অন্তরের হাতছানিতে সাড়া দিয়েছে। বন্ধুর বিপদের সময় সন্ধ্যার অন্ধকারে মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট উপস্থিত হয়েছে। সমাজ, ধর্ম কিংবা নীতিবোধ বন্ধুত্বের মানবিক সম্পর্কে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। উদ্দীপকে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও তাই 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতা এবং উদ্দীপকের আলোকে বলা যায় 'বিচ্ছিন্নতা নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসার সম্পর্কই মৌলিক' মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

অনেক দিন পরে করাচিতে শহিদ সোহরাওয়ার্দি যখন রোগ শয্যায় শায়িত তখন দিলীপ কুমারের একটি চিঠি তিনি পেয়েছিলেন। তার অনুরোধে চিঠিটা খুলে আমি তাকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। দিলীপ কুমার সেই চিঠিতে শহিদের অসুস্থতার সংবাদে ব্যাথিত হয়েছিলেন। সে কথা লিখেছিলেন এবং জানতে চেয়েছিলেন যে তিনি তার জন্য কিছু করতে পারেন কি না। চিঠির পাঠ শেষ হলে আমি লক্ষ করলাম যে শহিদ সোহরাওয়ার্দির চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে।

ক 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতায় কবি ও তার বন্ধু কোন গাছে উঠতেন?

খ. 'বার বার দেখি বন্ধুরই মুখ শুধু।' –বুঝিয়ে লিখুন।

গ. উদ্দীপক ও 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতার বৈসাদৃশ্যগুলো আলোচনা করুন।

ঘ "সাঁকোটা দুলছে' কবিতার বন্ধুর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা উদ্দীপকেও প্রকাশিত হয়েছে।" –বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. ক ৩. গ ৪. ক ৫. গ ৬. গ ৭. গ ৮. ঘ

আমার পরিচয়

সৈয়দ শামসুল হক

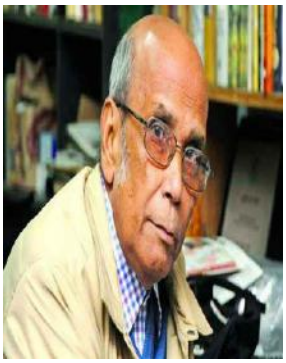

কবি-পরিচিতি

সৈয়দ শামসুল হক ১৯৩৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর কুড়িগ্রাম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ডা. সৈয়দ সিদ্দিক হুসাইন এবং মা সৈয়দা হালিমা খাতুন। তিনি ১৯৫০ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং এক বছর বিরতি দিয়ে জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন ও সেখান থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হয়ে কিছুদিন পড়াশুনা করেন কিন্তু তা শেষ করেননি। সেই থেকে তিনি লেখালেখিকে একমাত্র ব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছেন। সাংবাদিকতার সঙ্গে তিনি কিছুদিন যুক্ত ছিলেন। কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, চিত্রনাট্যলেখক এবং আরো বিচিত্র সাহিত্য-শিল্পধারার কীর্তিমান স্রষ্টা তিনি। সব্যসাচী লেখক হিসেবে তিনি অধিক পরিচিত। অবিরাম বিচিত্রতার পথে চলমান এই কবি ও লেখকের সৃষ্টিতে উঠে এসেছে নানা বিষয়। মাত্র ২৯ বছর বয়সে তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান। এছাড়াও তিনি একুশে পদক, স্বাধীনতা পদক, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, নাসিরুদ্দিন স্বর্ণপদকসহ বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন। সৈয়দ শামসুল হক ২০১৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ঢাকার একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : *একদা এক রাজ্যে, বিরতিহীন উৎসব, বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা, পরাণের গহীন ভিতর, অগ্নি ও জলের কবিতা, আমি জন্মগ্রহণ করিনি, রাজনৈতিক কবিতা*;

উপন্যাস : *এক মহিলার ছবি, সীমানা ছাড়িয়ে, খেলারাম খেলে যা, রক্তগোলাপ, নিষিদ্ধ লোবান, নীল দংশন*;

নাটক : *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, নূরলদীনের সারাজীবন, এখানে এখন, ঈর্ষা*।

ভূমিকা

'আমার পরিচয়' কবিতাটি সৈয়দ শামসুল হকের 'কিশোর কবিতা সমগ্র' থেকে সম্পাদিত আকারে চয়ন করা হয়েছে। আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতিসত্তা গঠনের পেছনে রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পটভূমি। কবিতাটির মাধ্যমে লেখক বাঙালি জাতির বর্তমান অবস্থার পেছনের বর্ণিল ইতিহাসের কথা তুলে ধরেছেন। ইতিহাসের ধারাবাহিক বিবর্তনে বাঙালি জাতি সেই সুদীর্ঘ সংগ্রামী ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির পরিচয় এবং কৃতি সন্তানদের যেন ভুলে না যায় সেই শ্রদ্ধা বোধ থেকেই তিনি কবিতাটি রচনা করেছেন।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- বাঙালি জনগোষ্ঠীর ইতিহাস-ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন;
- বাঙালি জাতির অসাম্প্রদায়িক ও ভেদবিচারহীন অস্তিত্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি,
আমি বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর চলি।
চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে।
তেরোশত নদী শুধায় আমাকে, 'কোথা থেকে তুমি এলে?'

আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে।
আমি তো এসেছি সওদাগরের ডিঙার বহর থেকে।
আমি তো এসেছি কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে।
আমি তে এসেছি পালযুগ নামে চিত্রকলার থেকে।

এসেছি বাঙালি পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার থেকে।
এসেছি বাঙালি জোড়বাংলার মন্দির-বেদি থেকে।
এসেছি বাঙালি বরেন্দ্রভূমে সোনা মসজিদ থেকে।
এসেছি বাঙালি আউল-বাউল মাটির দেউল থেকে।
আমি তো এসেছি সার্বভৌম বারো ভূঁইয়ার থেকে।
আমি তো এসেছি 'কমলার দীঘি', 'মহুয়ার পালা' থেকে।
আমি তো এসেছি তিতুমীর আর হাজী শরিয়ত থেকে।
আমি তো এসেছি গীতাঞ্জলি ও অগ্নি-বীণার থেকে।
এসেছি বাঙালি ক্ষুদিরাম আর সূর্য সেনের থেকে।
এসেছি বাঙালি জয়নুল আর অবন ঠাকুর থেকে।
এসেছি বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ থেকে।
এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর থেকে।

আমি যে এসেছি জয়বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে।
আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে।
এসেছি আমার পেছনে হাজার চরণচিহ্ন ফেলে।
শুধাও আমাকে 'এতদূর তুমি কোন প্রেরণায় এলে?'

তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির বীজমন্ত্রটি শোন নাই –
'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'
একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি, আজও একসাথে থাকবই –
সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকবই।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অগ্নি-বীণা– জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

অবন ঠাকুর– অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১–১৯৫১ খ্রি.) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি বিখ্যাত চিত্রশিল্পী; তবে শিশুসাহিত্যিক হিসেবেও তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ***আলপথ–*** জমির সীমানার পথ; এখানে হাজার বছর ধরে বাঙালি জাতির পথ চলার কথা বলা হয়েছে। ***কমলার দীঘি–*** মৈমনসিংহ গীতিকার একটি পালা।

কৈবর্ত বিদ্রোহ– আনুমানিক ১০০-৭৫ খ্রিস্টাব্দে মহীপালের বিরুদ্ধে অনন্ত-সামন্ত-চক্র মিলিত হয়ে যে বিদ্রোহ করেন তা-ই আমাদের ইতিহাসে কৈবর্ত বিদ্রোহ নামে খ্যাত; এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন কৈবর্ত সম্প্রদায়ের লোক; তাঁর নাম দিব্য বা দিব্বোক; বাঙালি জাতির বিদ্রোহের ঐতিহ্য বোঝাতে এই বিদ্রোহের উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্ষুদিরাম– ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮ খ্রি.) মেদিনীপুর জেলার মৌবনি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; শৈশব থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন; অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলবশত দুইজন ইংরেজ মহিলাকে হত্যা করেন; ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট এই মহান বিপণ্ডবীর ফাঁসির আদেশ কার্যকর হয়।

চরণচিহ্ন– পদ চিহ্ন, পায়ের ছাপ। ***চর্যাপদ–*** বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-ঐতিহ্যের প্রথম নিদর্শন; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে চর্যাপদের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন; ছয়শত শতাব্দী থেকে এগারশ শতকের মধ্যে পদগুলো রচিত হয়েছে; এই পদগুলোর মধ্যে প্রাচীন বাংলার অতি সাধারণ মানুষের প্রাণময় জীবন চিত্র ফুটে উঠেছে। **চিত্রকলা–** ছবি আঁকার বিদ্যা, পত্রলেখা, নকশা। ***জয়নুল–*** জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬ খ্রি.) কিশোরগঞ্জের কেন্দুয়া থানায় জন্মগ্রহণ করেন; 'শিল্পাচার্য' হিসেবে তিনি খ্যাত; দেশজ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পটভূমিতে তাঁর বিপুল শিল্পকর্ম রচিত; দুর্ভিক্ষ তাড়িত জীবন ও জগতের ছবি এঁকে তিনি অসামান্য এক জীবন-তৃষ্ণার পরিচয় দিয়েছেন; বাংলাদেশে শিল্পকলা আন্দোলনের তিনি পথিকৃৎ।

জয়বাংলা– মুক্তিযুদ্ধের সময়ে জাতীয় স্লোগান হিসেবে অসাধারণ এক প্রেরণা সঞ্চারী শব্দমালা; এই স্লোগান ঐক্য ও সংহতির প্রতীক।

তিতুমীর– চব্বিশ পরগনা জেলার হায়দরপুর গ্রামে ১৭৮২ সালে মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর জন্মগ্রহণ করেন; তিনি অত্যাচারী ইংরেজী ও হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছেন; ১৮৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে তিনি শহিদ হন। ***দেউল–*** দেবালয়।

পালযুগ– ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে গোপালের রাজ্য শাসনের মধ্য দিয়ে বঙ্গে পালযুগের সূচনা হয়; তারপর চারশত বছর পাল বংশের রাজত্ব টিকে ছিল; এ সময় শিল্প-সাহিত্যের অসামান্য বিকাশ সাধিত হয়; চিত্রকলায়ও এই সময়ের সমৃদ্ধি লক্ষযোগ্য; কবি আমাদের শিল্পের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য বোঝাতে পালযুগের চিত্রকলার উল্লেখ করেছেন।

পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার– বর্তমান নওগাঁ জেলার বদলগাছি থানায় পাহাড়পুর গ্রামে এই প্রাচীন বিহার অবস্থিত; ১৮৭৯ সালে স্যার কানিংহাম এই বিশাল কীর্তি আবিষ্কার করেন; দ্বিতীয় পাল রাজা শ্রী ধর্মপালদেব (রাজত্বকাল ৭৭৭-৮১০ খ্রি.) এই বিশাল বিহার তৈরি করেছিলেন; একে সোমপুর বিহারও বলা হয়; পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিহারগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম; কবি আমাদের পত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের পরিচয় দিতে পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহারের উল্লেখ করেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০–১৯৭৫ খ্রি.) গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; বাঙালি জাতির তিনি অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা; তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভাদীপ্ত নেতৃত্বে দীর্ঘ সংগ্রামের পথ অতিক্রম করে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতাযুদ্ধে জয়লাভ করে; তিনি আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক, মুক্তির প্রতীক, সমৃদ্ধির প্রতীক।

বরেন্দ্রভূমে সোনামসজিদ– বরেন্দ্রভূমে সোনামসজিদ বলতে চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত ছোট সোনামসজিদকে বোঝানো হয়েছে; বড় সোনামসজিদ ভারতের গৌড়ে অবস্থিত; হোসেন শাহের (রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) আমলে এই মসজিদটি নির্মিত হয়; অসাধারণ শিল্পসৌন্দর্যমণ্ডিত স্থাপত্যকর্ম হিসেবে সোনামসজিদ অন্যতম; কবি আমাদের মুসলিম ঐতিহ্যের সুমহান নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

বেদি– পূজার জন্য প্রস্তুত উচ্চভূমি। ***মহুয়ার পালা–*** মৈমনসিংহ গীতিকার একটি পালা। ***রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ–*** ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার অধিকারের জন্য এদেশের মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে ঢাকার রাজপথ। আর সেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সাফল্যের পথ ধরেই সূচিত হয় স্বাধীনতা আন্দোলন। **প্রেরণা–** উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রবৃত্তি ইত্যাদির সঞ্চার, প্রবল উচ্ছ্বাস। **সাম্য–** সমতা। **গীতাঞ্জলি–** বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ। ***সওদাগরের ডিঙার বহর–*** মঙ্গলকাব্যে চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যের কথা আছে। কবি আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ঐতিহ্য বোঝাতে এই লোককাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

সার্বভৌম বারো ভূঁইয়া– বাংলায় পাঠান কর্‌রানী বংশের রাজত্ব দুর্বল হয়ে পড়লে খুলনা, বরিশাল, সোনারগাঁও, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টে স্বাধীন জমিদারদের উত্থান ঘটে; ১৫৭৫ সালে মোগল সম্রাট আকবর বাংলা জয় করার পর এই স্বাধীন জমিদারগণ ঈসা খাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মোগল শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান; ইতিহাসে এঁরাই বারোভূঁইয়া নামে পরিচিত; এঁরা হলেন ঈশা খাঁ, চাঁদ রায়, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, লক্ষ্মণ মাণিক্য প্রমুখ।

সূর্য সেন– মাস্টার দা সূর্য সেন (১৮৯৩-১৯৩৪ খ্রি.) চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; আজীবন তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন; ১৯৩০ সালে তিনি চট্টগ্রামকে ইংরেজমুক্ত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন; কিন্তু বেশিদিন তা রক্ষা করতে পারেননি; ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারি তাঁর ফাঁসি হয়।

হাজী শরীয়ত– হাজী শরীয়তউল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০ খ্রি.) মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার সামাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল মক্কায় অবস্থান করে ইসলাম ধর্ম বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন; তিনি ধর্মকে আশ্রয় করে সকল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন; তাঁর এই আন্দোলনকে ফরায়েজি আন্দোলন বলে; এরপর তিনি আবদুল ওহাব নামক এক ধর্মসংস্কারকের মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে ওহাবি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন; তিনি সাধারণ মানুষকে ধর্মের প্রকৃত রূপ ও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন; এছাড়া বিদেশি শাসন-শোষণ, জমিদার, জোতদার ও মহাজনদের অত্যাচার থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য আন্দোলন করেন।

সারসংক্ষেপ :

বাঙালি জাতির প্রাথমিক পরিচয় এই যে, তারা এই বাংলায় জন্মেছে, এবং বাংলা ভাষায় কথা বলে। কিন্তু চেতনার দিক থেকে, অস্তিত্বের দিক থেকে, তারা বহু যুগের অর্জনের সঙ্গে যুক্ত। বাঙালি জনগোষ্ঠী বহন করে চলেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান সংস্কৃতির নানা উপাদান। এর সাথে মিশেছে আউল-বাউল সংস্কৃতি আর ইতিহাসের নানা ঘটনা। অতীতের হাজারো চরণচিহ্ন এসে মিলেছে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে। এসব ঐতিহ্যে গড়া এ জনগোষ্ঠী অসাম্প্রদায়িক এবং মানবিক। বিভেদহীন সুষম সমাজ প্রতিষ্ঠাই হবে আমাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. চর্যাপদের পাণ্ডুলিপি কে আবিষ্কার করেন?
   ক. মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী — খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
   গ. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — ঘ. ড. এনামুল হক

২. যে আন্দোলনের সাফল্যের পথ ধরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আসে–
   ক. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন — খ. ১৯৬৯- এর গণঅভ্যুত্থান
   গ. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন — ঘ. ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। আদিকাল হতে বর্তমান পর্যন্ত বাংলায় যোগ হয়েছে বিশ্বের নানা জাতির সংস্কৃতি। এতে আমাদের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে, বহুমাত্রিকতা লাভ করেছে।

৩. উদ্দীপকের সাথে নিচের কোন কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে?
   ক. আমার সন্তান — খ. প্রাণ
   গ. আমার পরিচয় — ঘ. সাঁকোটা দুলছে

৪. এই সাদৃশ্যের কারণ হচ্ছে যে বিষয়টি–
   i. বাংলার ঐতিহ্য
   ii. বাংলার সংস্কৃতি
   iii. বাংলার সম্পদ

নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i — খ. ii
   গ. iii — ঘ. i ও ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'আমার পরিচয়' কবিতায় কবি কীসের ছবি আঁকতে চেয়েছেন?
   ক. যুদ্ধের — খ. বিদ্রোহের
   গ. ধ্বংসের — ঘ. সাম্যের

৬. 'এসেছি বাঙালি ক্ষুদিরাম আর সূর্যসেনের থেকে।' চরণটিতে প্রকাশিত হয়েছে–

i. বাঙালির স্বাধীনতা স্পৃহা

ii. বাঙালির বিদ্রোহী চেতনা

iii. বাঙালির ঐতিহ্য চেতনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i ও ii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বাংলা আমার জীবনানন্দ বাংলা প্রাণের সুর।
আমি একবার দেখি, বারবার দেখি
দেখি বাংলার মুখ।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে 'আমার পরিচয়' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে–

ক. আত্মপরিচয়ে　　খ. সংস্কৃতিতে

গ. রাজনীতিতে　　ঘ. অর্থনীতিতে

৮. উদ্দীপক ও 'আমার পরিচয়' কবিতার সাদৃশ্যের মূলে রয়েছে–

ক. একাত্মতাবোধ　　খ. সামগ্রিকতা

গ. বিদ্রোহী চেতনা　　ঘ. আপোসকামিতা

সৃজনশীল প্রশ্ন :

বাংলা সর্ব ঐশীশক্তির পীঠস্থান। হেথায় লক্ষ লক্ষ যোগী-মুনি-ঋষি-তপস্বীর পীঠস্থান, সমাধি; সহস্র ফকির-দরবেশ অলি-গাজির দরগা পরম পবিত্র। হেথায় গ্রামে হয় আজানের সাথে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি। এখানে যে শাসনকর্তা হয়ে এসেছে সেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। বাংলার আবহাওয়ায় আছে স্বাধীনতা মন্ত্রের সঞ্জীবনী শক্তি। আমাদের বাংলা নিত্য মহিমাময়ী, নিত্য সুন্দর, নিত্য পবিত্র।

ক. বৌদ্ধ বিহার কোথায় অবস্থিত?

খ. চর্যাপদ কী? –বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'আমার পরিচয়' কবিতার সাদৃশ্য নির্ণয় করুন।

ঘ. উদ্দীপকে 'আমার পরিচয়' কবিতার আংশিক চিত্র ফুটে উঠেছে, পূর্ণাঙ্গ ছবি উঠে আসেনি। –আলোচনা করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. বৌদ্ধবিহার বর্তমান নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত।

খ. 'চর্যাপদ' প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের সংকলন।

চর্যাপদ এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যেরও প্রথম নিদর্শন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে চর্যাপদের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। চর্যাপদের রচনাকাল খ্রিস্টিয় ছয় শতক থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত। কাহ্ন পা ও ভুসুকু পা চর্যাপদের প্রধান কবিরূপে পরিচিত। চর্যাপদগুলো একটি ধর্মীয় আবহে রচিত হলেও এতে প্রাচীন বাংলার সাধারণ মানুষের প্রাণময় জীবন চিত্র ফুটে উঠেছে।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'আমার পরিচয়' কবিতার অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

বাঙালি জাতিসত্তার একটি সমৃদ্ধ অতীত রয়েছে। এখানকার অধিবাসীরা অভিন্ন সংস্কৃতি এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনায় লালিত। বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে নানা সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে। তবুও এখানকার মানুষ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঐতিহ্যমণ্ডিত আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। বাঙালি জাতির এই অসাম্প্রদায়িক মনোভাব দীর্ঘদিনের। এখানকার সকল মানুষ আনন্দময় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে বাংলা সর্ব ঐশীশক্তির পীঠস্থান। এখানে লক্ষ লক্ষ যোগী-মুনি-ঋষি-তপস্বীর আস্তানা রয়েছে। এ ভূমি সহস্র ফকির-দরবেশ, অলি-গাজির পরম পবিত্র দরগা ধারণ করে। এখানকার গ্রামে আজানের সাথে বেজে ওঠে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি। 'আমার পরিচয়' কবিতায়ও দেখি এক অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশকে। বাংলায় একইসঙ্গে গীতাঞ্জলি আর অগ্নি-বীণা আগ্রহের বস্তু। এখানে অবন ঠাকুর, জয়নুল, ক্ষুদিরাম আর তিতুমিরের কোনো প্রভেদ করা হয় না। কবি বলেন, এখানে আমরা একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি এবং আজও একসাথে থাকব। আমরা সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের চেতনা আঁকব। বস্তুত বাঙালি জাতির সংহতি ও ঐক্য বলতে গেলে এক ও অভিন্ন। উদ্দীপকে বাঙালি জাতির অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে 'আমার পরিচয়' কবিতার কবিও অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। এই অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিষয়টিতেই উদ্দীপক ও 'আমার পরিচয়' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে কেবল বাঙলার অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিষয়টি উঠে এসেছে, অন্যান্য দিক ফুটে উঠেনি।

বাংলার ইতিহাস হাজার বছরের। এর রয়েছে একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পটভূমি। এখানে যুগে যুগে নানা আন্দোলন, বিপ্লব, আর মতাদর্শের বিকাশ ঘটেছে। ইতিহাসের বিচিত্র বাঁক ও মোড় ঘুরে আজ আমরা এসে পৌঁছেছি আজকের বাংলায়। বাঙালির ঐতিহ্যে রয়েছে বিপ্লব-বিদ্রোহ, আতিথেয়তা, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি।

উদ্দীপকে বাঙালি জাতির অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের দিকটি ফুটে উঠেছে। এখানকার গ্রামে আজানের সাথে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি বেজে ওঠে। এ ভূমি লক্ষ লক্ষ মুনি-ঋষির পীঠস্থান। এখানে আরো রয়েছে অলি-গাজির পরম পবিত্র দরগা। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে এখানকার মানুষ এক ও অভিন্ন চেতনায় বিশ্বাস করে। 'আমার পরিচয়' কবিতায়ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার কথা ফুটে উঠেছে। কবিতাটিতে কবি বলেন, বাঙালি জাতির মূলমন্ত্র হচ্ছে সবার উপরে মানুষ সত্য। আর বাংলাদেশে আমরা একসাথে আছি, সবসময় একসাথে থাকব। 'আমার পরিচয়' কবিতায় বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি ছাড়া আরও অনেক বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। কবিতায় রয়েছে বাঙালির জীবন প্রবাহ, উৎসব, নাচ, গান, পালা-পার্বণ, বিপ্লব-বিদ্রোহ, আন্দোলন, সংগ্রামী জীবন। কবি আলোচ্য কবিতায় বাঙালির জীবনের একটি ধারাক্রমকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন।

'আমার পরিচয়' কবিতাটি বাঙালি-ইতিহাসের একটি ধারাক্রম। উদ্দীপকে এই ধারাক্রমের মাত্র একটি বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। উদ্দীপকে শুধু বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার বর্ণনাটিই উঠে এসেছে। এখানে অন্য বিষয়গুলো আলোচিত হয়নি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'আমার পরিচয়' কবিতার আংশিক ছবি ফুটে উঠেছে, পূর্ণাঙ্গ চিত্র স্থান পায়নি।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

গোপালই প্রথম যথার্থ বাঙালি যিনি পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ঘটান। এ সময়ে একটি স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের উদ্ভব ঘটে। পাল রাজবংশের শাসনকালে জাতিভেদ প্রথার বিলোপ ঘটে, গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন দেখা যায়, চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য এ অঞ্চলে গড়ে উঠে। সবচেয়ে বড়কথা, এ সময় বৌদ্ধবিনয়, সাম্য এবং মমতার একটি আদর্শ এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক. 'আলপথ' কী?

খ. বাংলার ইতিহাসে পালযুগ কেন বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত?

গ. উদ্দীপকটি 'আমার পরিচয়' কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ করে? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. ''উদ্দীপকটি 'আমার পরিচয়' কবিতার অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধারণ করেছে।" –উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. ক ৩. গ ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. ঘ ৭. ক ৮. ক

স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো

নির্মলেন্দু গুণ

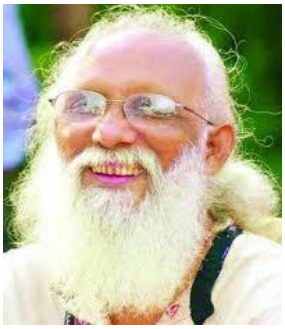

কবি-পরিচিতি

নির্মলেন্দু গুণ ১৯৪৫ সালের ২১ জুন নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা উপজেলার কাশবন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সুখেন্দু প্রকাশ গুণ চৌধুরী এবং মাতা বীণাপানি গুণ। মাত্র চার বছর বয়সে নির্মলেন্দু গুণ তাঁর মাতাকে হারান। বাবা আবার বিয়ে করলে সৎমা চারুলতার কাছে তাঁর হাতেখড়ি হয়। ১৯৬২ সালে মাধ্যমিক ও ১৯৬৪ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি পান। এরপরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি ও বাংলা বিভাগ এবং বুয়েটে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েও পড়তে পারেননি। অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৯ সালে প্রাইভেটে বিএ পাস করেন। পেশাগত জীবনে তিনি একজন সাংবাদিক। মেট্রিক পরীক্ষার আগেই নেত্রকোনা থেকে প্রকাশিত 'উত্তর আকাশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা 'নতুন কাণ্ডারী' প্রকাশিত হয়। তাঁর কবিতায় শ্রেণিসংগ্রাম, প্রতিবাদী চেতনা, নারী ও প্রেম মূল শিল্প-উপাদান হিসেবে গৃহীত। ষাটের দশকের সূচনা থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত তিনি কবিতায় ও গদ্যে স্বচ্ছন্দে সৃজনশীল হলেও কবি হিসেবেই তিনি খ্যাত। কবিতার পাশাপাশি আত্মজৈবনিক রচনা, ভ্রমণসাহিত্য ও গদ্যরচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তিনি এখনও সাহিত্যসাধনা করে যাচ্ছেন। কাব্যসাহিত্যে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : *প্রেমাংশুর রক্ত চাই, না প্রেমিক না বিপ্লবী, চাষাভুষার কাব্য, বাংলার মাটি বাংলার জল, দূর হ দুঃশাসন, নিরঞ্জনের পৃথিবী, পঞ্চাশ সহস্র বর্ষ, আমি সময়কে জন্মাতে দেখেছি*;

ছোটগল্প : *আপন দলের মানুষ*;

আত্মজীবনীমূলক : *আমার ছেলেবেলা, আমার কণ্ঠস্বর, আত্মকথা*;

উপন্যাস : *দেশান্তর*।

ভূমিকা

'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতাটি নির্মলেন্দু গুণের 'চাষাভুষার কাব্য' গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণের দৃঢ়তা ও তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সম্পর্কে এই কবিতা থেকে ধারণা লাভ করা যাবে। স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট, গণজাগরণের স্বরূপ এবং বাংলাদেশ সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা প্রকাশ করতেই লেখকের এই প্রচেষ্টা।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- এখনকার শিশুপার্ক ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সাথে সেদিনের রেসকোর্স ময়দানের তুলনা করতে পারবেন;
- বঙ্গবন্ধুর তেজোদ্দীপ্ত ঘোষণার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন;
- 'স্বাধীনতা' শব্দটির গভীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে : 'কখন আসবে কবি?'

এই শিশু পার্ক সেদিন ছিল না,
এই বৃক্ষে ফুলে শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না,
এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকেল সেদিন ছিল না।
তা হলে কেমন ছিল শিশু পার্কে, বেঞ্চে, বৃক্ষে, ফুলের বাগানে
ঢেকে দেয়া এই ঢাকার হৃদয় মাঠখানি?

জানি, সেদিনের সব স্মৃতি মুছে দিতে হয়েছে উদ্যত
কালো হাত। তাই দেখি কবিহীন এই বিমুখ প্রান্তরে আজ
কবির বিরুদ্ধে কবি,
মাঠের বিরুদ্ধে মাঠ,
বিকেলের বিরুদ্ধে বিকেল,
উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান,
মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ...।

হে অনাগত শিশু, হে আগামী দিনের কবি,
শিশু পার্কের রঙিন দোলনায় দোল খেতে খেতে তুমি

একদিন সব জানতে পারবে; আমি তোমাদের কথা ভেবে
লিখে রেখে যাচ্ছি সেই শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প।
সেদিন এই উদ্যানের রূপ ছিল ভিন্নতর।
না পার্ক না ফুলের বাগান, –এসবের কিছুই ছিল না,
শুধু একখণ্ড অখণ্ড আকাশ যেরকম, সেরকম দিগন্ত পণ্ঢাবিত
শুধু মাঠ ছিল দূর্বাদলে ঢাকা, সবুজে সবুজময়।
আমাদের স্বাধীনতা প্রিয় প্রাণের সবুজ এসে মিশেছিল
এই ধু ধু মাঠের সবুজে।
কপালে কব্জিতে লালসালু বেঁধে
এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক,
লাঙল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক,
হাতের মুঠোয় মৃত্যু, চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত,
নিম্নবিত্ত, করুণ কেরানি, নারী, বৃদ্ধ, ভবঘুরে
আর তোমাদের মতো শিশু পাতা-কুড়ানিরা দল বেঁধে।
এই কবিতা পড়া হবে, তার জন্য কী ব্যাকুল
প্রতীক্ষা মানুষের : 'কখন আসবে কবি ?' 'কখন আসবে কবি?'

শত বছরে শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী ?

গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি :
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অখণ্ড– সমগ্র, আস্ত। ***অতঃপর কবি এসে মঞ্চে দাঁড়ালেন–*** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতামঞ্চে এসে দাঁড়ালেন লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে। ***উদ্যত–*** প্রবৃত্ত, প্রস্তুত। ***উদ্যান–*** বাগান। ***উন্মত্ত–*** দারুণ উত্তেজনায় আবেগবিহ্বল, ক্ষিপ্ত। ***উলঙ্গ কৃষক–*** খালিগায়ের দরিদ্র গ্রামীণ কৃষক।

এই শিশু পার্ক সেদিন ছিল না– বর্তমানে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে উত্তরপ্রান্তের একটি অংশজুড়ে রয়েছে শিশু পার্ক; তখন এ শিশু পার্ক ছিল না, তখন এর নাম ছিল রমনা রেসকোর্স; এই রেসকোর্সের উত্তর প্রান্তে নির্মিত বিরাট প্রশস্ত মঞ্চ থেকে ৭ই মার্চ (১৯৭১) বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন; বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সেই স্মৃতিময় স্থানটির কোনো অস্তিত্ব এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না; সেখানে এখন নানা রঙ-বেরঙের টুল-বেঞ্চি, খেলনারাজ্য, আর চারদিকে বাগান। কবি মনে করেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয় নিংড়ানো স্বাধীনতা সংগ্রামের বাণী যেখান থেকে উচ্চারিত হয়েছিল সে স্মৃতিময় স্থানটি এভাবেই সুকৌশলে ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম/ এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম– ১৯৭১-এর ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন, এদেশের মুক্তির ডাক দেন; তাঁর বক্তব্যের এটাই ছিল মূলকথা; তাঁর এ আহ্বানে সমগ্র দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অবশেষে আমরা জয়ী হই।

কখন আসবে কবি?– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কল্পনা করা হয়েছে কবিরূপে; কারণ তিনি বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্ন ও অনুভূতির রূপকার; তাঁর বাঙালি হৃদয়ের আবেগপ্রবণ প্রকাশকে কবিসুলভই মনে হয়; ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'নিউজউইক' পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে 'রাজনীতির কবি' বলে আখ্যায়িত করে লেখা হয়, তিনি 'লক্ষ লক্ষ মানুষকে আকর্ষণ করতে পারেন সমাবেশে এবং আবেগময় বাগ্মিতায় তরঙ্গের পর তরঙ্গে তাদের সম্মোহিত করে রাখতে পারেন; তিনি রাজনীতির কবি'; সুতরাং বঙ্গবন্ধুকে 'কবি' অভিধাটি যথার্থভাবেই দিয়েছেন একালের কবি।

কবির বিরুদ্ধে কবি ... মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ– কবি এখানে বোঝাতে চেয়েছেন বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার পর এদেশে অশুভশক্তির যে উত্থান ঘটেছে তাতে সব ইতিবাচক ভাবনা, সৌন্দর্য ও কল্যাণকে যেন সমাহিত করার প্রয়াস চলেছে।

করুণ কেরানি– স্বল্প বেতনে দারিদ্র্যের মধ্যে করুণভাবে জীবন-যাপনকারী সাধারণ চাকরিজীবী কেরানি।

গণসূর্যের মঞ্চ– জনগণের নেতা, যাঁর তেজীয়ান দ্যুতি চারদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তিনি যেন এক গণসূর্য; সেই নেতা যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে সেটা তো গণসূর্যের মঞ্চ; তাছাড়া সেদিন বিকেলে সূর্যের আলোতে ছিল প্রখরতা।

জনসমুদ্র– বিরাট জনসমাবেশ, বিপুল জনতা। **জোয়াল–** লাঙল বা গাড়িতে সংযুক্ত বলদের কাঁধে যে কাষ্ঠখণ্ড থাকে যার সাথে সাড়ি বা লাঙল বাঁধা হয়, যুগন্ধর। ***জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে–*** রমনা রেসকোর্সে সমবেত লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশকে কবি কল্পনা করেছেন জনসমুদ্রের বাগানরূপে; সেই জনসমুদ্রের একদিকে ছিল মঞ্চ, কবির দৃষ্টিতে সেটি যেন সেই জনসমুদ্রের তীর।

তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল/ হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার/ সকল দুয়ার খোলা,– কবি তাঁর বর্ণনাকে আরও সুন্দর ও অর্থবহ করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' ও বিষ্ণু দে-র 'ঘোড়সওয়ার' কবিতার চরণ ব্যবহার করেছেন খুব নৈপুণ্যের সঙ্গে; বাংলার মানুষের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বাধীনতারূপী নৌকার পাল তুলে যখন ডাক দিলেন, তখন জনতার জোয়ারের স্রোতে সে নৌকায় লাগল উদ্দাম হাওয়া, ছুটে চলল সেই স্বপ্নের বহু আকাঙ্ক্ষিত তরী।

তন্দ্রাচ্ছন্ন– ঘুমে আচ্ছন্ন। ***দারুণ ঝলকে–*** প্রচণ্ড ঝলক দিয়ে, প্রচণ্ড আলোর দোলা লাগিয়ে। **দিগন্ত–** দিকের শেষ সীমা। ***দিগন্ত পণ্ডাবিত–*** আকাশ-ছোঁয়া, যে মাঠে দিগন্ত এসে মিশেছে এমন বিশাল। ***দূর্বাদলে–*** সবুজ ঘাসে। **দৃপ্ত–** গর্বিত, তেজস্বী। ***পলকে–*** মুহূর্তের মধ্যে। ***পাতা-কুড়ানিরা–*** যারা পাতা-কুড়িয়ে জীবন ধারণ করে। ***প্রাণের সবুজ–*** প্রাণের সজীবতা ও তারুণ্য; দরিদ্র কিশোর-কিশোরীর দল। **প্লাবিত–** জলমগ্ন, বন্যায় ডুবে গেছে এমন। ***বজ্রকণ্ঠ বাণী–*** সহজে উদ্দীপ্ত দ্যুতিময় বঙ্গবন্ধুর বাণী। ***বজ্রকণ্ঠ–*** মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে বজ্র বা বিদ্যুতের ধ্বনি প্রচণ্ড শক্তিধর শব্দের মতো; এখানে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠস্বরকে বোঝানো হয়েছে। **বিবর্ণ–** মলিন, ফ্যাকাসে। ***বিমুখ প্রান্তরে–*** বিরুদ্ধ পরিবেশের মাঠ, প্রতিকূল পরিবেশে। ***ভবঘুরে–*** যাদের কোনো কাজকর্ম নেই, বেকার। ***মাঠের সবুজ–*** মাঠের সুন্দর সবুজ পরিবেশ।

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে– প্রকৃতপক্ষে বাংলার স্বাধীনতাসূর্য অস্তমিত হয় পলাশীর প্রান্তরে ১৭৫৭ সালে; ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন হয়, যা সিপাহী বিপণ্ডব; ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপণ্ডবী সূর্যসেনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র যুদ্ধ হয় জালালাবাদ পাহাড়ে; অতঃপর পাকিস্তান সৃষ্টির এক বছর পর থেকে শুরু হয় পাকিস্তানি শাসকদের নানা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম; ১৯৪৮ সালের ভাষা সংগ্রাম থেকে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, তারপর ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ; সুতরাং ইতিহাসের বহু অধ্যায় পার হয়ে, নানা সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি প্রিয় স্বাধীনতা।

শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প– ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে যে বিকেলটিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য, সে বিকেলটি কবির দৃষ্টিতে ছিল বাংলার মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ বিকেল; কারণ এদিন বিকেলেই তিনি স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। ***রোধে–*** বন্ধ করে দেওয়া, বাধা দেওয়া।

লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা– ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাংলার মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠনিঃসৃত বক্তব্য শোনার জন্য ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে অপেক্ষা করছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ; তারা ব্যাকুল হয়ে বসেছিল বঙ্গবন্ধুর অপেক্ষায়; রেসকোর্সের মাঠে এসে তিনি কী নির্দেশ দেন, কী আশার বাণী শোনান সে জন্য সেদিন লক্ষ প্রাণ হয়েছিল আকুল; কারণ পাকিস্তানি শাসকরা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের বিজয়কে নস্যাৎ করার সমস্ত পরিকল্পনার ছক তৈরি করে বসেছিল; ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির বিজয়কে তারা স্বীকার করে নিতে পারেনি; পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রকারীদের সামরিক প্রতিভূ ইয়াহিয়া খান ১৯৭১-এর ১ মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত করে দেয়; বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে শুরু হয় সমগ্র বাঙালি জাতির ঐক্যবদ্ধ অসহযোগ আন্দোলন; বাংলাদেশ হয়ে ওঠে গণমানুষের আন্দোলনে টালমাটাল; ক্ষুব্ধ দেশের মানুষ; ফেটে পড়ছে তাদের ক্রোধ; তারা তাকিয়ে আছে তাদের অকৃত্রিম বন্ধু, প্রাণের মানুষ, কোটি মানুষের নেতা শেখ মুজিবের দিকে; সমস্ত দেশের মানুষ যেন এ বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েছে; সেদিন রেসকোর্সের মাঠে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা শোনার জন্য যারা এসেছিল সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে ছিল ব্যাকুলতা, বঙ্গবন্ধু কী বলবেন আজ; প্রত্যেক শ্রোতাই যেন এক একজন বিদ্রোহী; এ বিদ্রোহ ছিল পাকিস্তানি স্বৈরশাসক ও সামরিকতন্ত্রের অন্যায় ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে।

শোভিত– সজ্জিত। ***সবুজ সবুজময়–*** সবুজ ঘাসে আবৃত।

স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের– 'স্বাধীনতা' শব্দটি এখন অভিধানের একটি নিছক শব্দ নয়; এ শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম ও মুক্তির প্রসঙ্গ যুক্ত; তাই ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ যখন বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হলো : এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, তখন 'স্বাধীনতা' শব্দটি পেল নতুন অর্থ ও ব্যঞ্জনা।

সারসংক্ষেপ :

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ১৯৭১-এর ৭ মার্চ সমবেত হয়েছিল অসংখ্য মানুষ। বিচিত্র পেশা-বয়স আর শ্রেণির মানুষ। ওই সবুজ দূর্বাদলে ঢাকা ময়দানে তারা সবাই এসেছিল একটি কণ্ঠের আওয়াজ শোনার জন্য। সেই ইতিহাস ঢেকে দেওয়ার জন্যই হয়ত বিস্তীর্ণ দূর্বাদল পরে ঢেকে দেওয়া হয়েছে শিশুপার্কের বেঞ্চে, ফুলে আর বৃক্ষে। কিন্তু সে ইতিহাস মুছে যাওয়ার নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ হায়েনার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সেদিন এখানে এসেছিল। আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখানেই দিয়েছিলেন সেই অমর ঘোষণা: 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এ যেন এক অমর কবিতা, আর এই ঘোষণাকারী এক মহান কবি। তাঁর ওই মহাকাব্যিক ঘোষণার মধ্য দিয়েই 'স্বাধীনতা' শব্দটি চিরকালের মতো আমাদের হলো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবি বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে কী মনে করেন?
ক. অমর কবিতা খ. কালজয়ী গান
গ. মননশীল প্রবন্ধ ঘ. মহৎ ছোটগল্প

২. 'প্রাণের সবুজ' বলতে কবি বুঝিয়েছেন –
ক. সবুজ পোশাক খ. প্রাণের বার্ধক্য
গ. মনের আনন্দ ঘ. প্রাণের সজীবতা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বাংলার মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠনিঃসৃত বক্তব্য শোনার জন্য ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে অপেক্ষা করছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ। তারা ব্যাকুল হয়ে বসেছিল বঙ্গবন্ধুর অপেক্ষায়।

৩. উদ্দীপকের বঙ্গবন্ধুকে 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায় কী অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে?
ক. নেতা খ. পিতা
গ. কবি ঘ. নায়ক

৪. উদ্দীপক এবং 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতাটির মিল রয়েছে যে বিষয়ে–
i. জনতার জমায়েত ii. সংগ্রামী মনোভাব iii. বঙ্গবন্ধুর ভাষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. কবি কীভাবে এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন?
ক. আলস্য ভরে খ. দৃপ্ত পায়ে গ. দুঃখিত চিত্তে ঘ. আনন্দিত চিত্তে

৬. 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায় কবিরূপে কল্পনা করা হয়েছে–
ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দিকে
গ. শেরে বাংলা একে ফজলুল হককে ঘ. মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হতে চলেছে–
সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে, হে স্বাধীনতা।

৭. উদ্দীপকে 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' –কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?
i. স্বাধিকারের কথা ii. মুক্তিযুদ্ধের কথা iii. স্বাধীনতার কথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii

৮. উদ্দীপকে প্রতিফলিত চেতনা 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার কোন চরণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?
i. এই ধুধু মাঠের সবুজে ii. এই শিশু পার্ক সেদিন ছিল না iii. সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের হলো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

এসেছি বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ থেকে।
এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর থেকে।

আমি যে এসেছি জয়বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে।
আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে।
এসেছি আমার পেছনে হাজার চরণ চিহ্ন ফেলে।
শুধাও আমাকে 'এতদূর তুমি কোন প্রেরণায় এলে?

ক. কবি নির্মলেন্দু গুণের পেশা কী?
খ. কবি 'শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প' বলতে কী বুঝিয়েছেন?
গ. উদ্দীপকের বজ্রকণ্ঠ 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায় কার বজ্রকণ্ঠের পরিচয় প্রকাশ করে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "জয়বাংলার বজ্রকণ্ঠের মাধ্যমেই আমরা আমাদের স্বাধীনতা পেয়েছি।" –উদ্দীপক ও 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. কবি নির্মলেন্দু গুণের পেশা সাংবাদিকতা।

খ. 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায় কবি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বিকালের কথাকে শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প বলে অভিহিত করেছেন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাস ছিল বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের উত্তাল সময়। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে যে বিকেলটিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য, কবির দৃষ্টিতে সে বিকেলটি ছিল বাংলার মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ বিকেল। কারণ এদিন বিকেলেই তিনি বাংলার স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। কবির কাছে মনে হয়েছে এটি বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'বজ্রকণ্ঠ' 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বজ্রকণ্ঠের পরিচয় প্রকাশ করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি অবিসংবাদিত নাম। তিনি বাংলাদেশের জাতির জনক। তাঁর দেশপ্রেম, সাহস, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং অধিকার-বঞ্চিত মানুষের জন্য অতুলনীয় লড়াই পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তিনি বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেন। ফলস্বরূপ বাঙালি জাতি এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

উদ্দীপকে 'জয়বাংলা' শ্লোগানের কথা বলা হয়েছে। 'জয়বাংলা' শ্লোগানের বীজমন্ত্রটি বাঙালি জাতিকে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর এই শ্লোগানটি দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন তিনি। অন্যদিকে 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায়ও বজ্রকণ্ঠের উল্লেখ রয়েছে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। উক্ত ভাষণে তিনি বাঙালি জাতিকে বজ্রকণ্ঠে স্বাধীনতার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বজ্রকণ্ঠের উচ্চারণেই সেদিন বাঙালি জাতি স্বাধীনতার দিশা পায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বজ্রকণ্ঠটি 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বজ্রকণ্ঠের পরিচয়কে প্রকাশ করে।

ঘ. উদ্দীপক এবং 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতা, উভয়টিতে উচ্চারিত হয়েছে জয়বাংলা বজ্রকণ্ঠের মাধ্যমে আমরা আমাদের স্বাধীনতা পেয়েছি।

'স্বাধীনতা' শব্দটি অভিধানের একটি নিছক শব্দমাত্র নয়। এ শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম ও মুক্তির প্রসঙ্গ যুক্ত। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রমনার রেসকোর্স ময়দানে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্র শুনিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সেই দ্যুতিময় বাণী শোনার জন্য সেদিন সেই ময়দানে জমায়েত হয়েছিল লক্ষ লক্ষ জনতা। বঙ্গবন্ধু সেদিন বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এটা ছিল এদেশের প্রতিটি মানুষের অন্তরে লালিত আকাঙ্ক্ষা। এ ছিল এক সচেতন দ্রোহ। এ বিদ্রোহ ছিল পাকিস্তানি স্বৈরশাসক ও সামরিকতন্ত্রের অন্যায় এবং ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ।

উদ্দীপকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধুর 'জয় বাংলা' শ্লোগানের কথাটি উঠে এসেছে। উদ্দীপকের কবি জয় বাংলার বজ্রকণ্ঠকে তার চেতনায় ধারণ করেছেন। অন্যদিকে 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায় জয় বাংলার বজ্রকণ্ঠকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার নিয়ামক শক্তি হিসাবে বিবেচনা করেছেন। কেননা বঙ্গবন্ধু একাত্তর সালের ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে 'জয় বাংলা' বজ্রকণ্ঠের মাধ্যমে পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের নিগড় থেকে বাঙালি জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য ডাক দেন। আর এই বজ্রকণ্ঠের ডাক শুনেই বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনিয়ে আনে।

'স্বাধীনতা এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার কবি মনে করেন 'জয় বাংলা'র বজ্রকণ্ঠের মাধ্যমে আমরা বাংলার স্বাধীনতা পেয়েছি। উদ্দীপকের কবির চেতনায়ও একই ধারণা প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায়, 'জয় বাংলা'র বজ্রকণ্ঠের মাধ্যমেই আমরা স্বাধীনতা শব্দটি পেয়েছি' মন্তব্যটি যথার্থ।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

যত দিন রবে পদ্মা মেঘনা
গৌরী যমুনা বহমান
তত দিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।
দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা
রক্তগঙ্গা বহমান
নাই নাই ভয়,হবে হবে জয়
জয় মুজিবুর রহমান।

ক. 'পাতা-কুড়ানিরা' কারা?
খ. 'শত বছরে শত সংগ্রাম শেষে' –উক্তিটি বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকটি 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার কোন দিককে প্রতিফলিত করেছে?
ঘ. "উদ্দীপকের শেখ মুজিবুর রহমান 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায় বাংলার রাজনীতির অমর কাব্যের কবি।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. ঘ ৩. গ ৪. ঘ ৫. খ ৬. ক ৭. গ ৮. গ

সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন–
আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স টিউটর

ড. মো. চেঙ্গীশ খান
সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা), ওপেন স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫।
ইমেইল: chenggish@gmail.com
এবং
মেহেরীন মুনজারীন রত্না
সহকারী অধ্যাপক (বাংলা), ওপেন স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫।
ইমেইল: meherin2010.bou@gmail.com